UCB

সাফল্য সংকলন

আমরাই পারি

ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন

সংখ্যা- ০১ | মার্চ ২০২৫

UNITED COMMERCIAL BANK PLC | UCB

ভরসার নতুন জানালা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৫

সাফল্যের গল্প ৭

পদ নয়, প্রাণের নেতৃত্ব: ইউসিবির নীরব আলোকবর্তিকা ৭

অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন নতুন যোগদানকারী খাদিজা ৭

সমন্বিত উদ্যোগ সফলতার চাবিকাঠি ৮

শ্রেষ্ঠত্বের পথে নীরব নেতৃত্ব দনিয়া শাখার শামিমা নাসরিন ৮

নিঃশব্দে গড়া সাফল্য: শেখ আবুল বাশারের দৃষ্টান্ত ৮

আস্থার ছাউনি গড়লেন সাহাদাত করিম ৮

যেখানে ঐক্য— সেখানেই অগ্রগতি ৯

অনুপ্রেরণার উদাহরণ ইবতিদা ফাহিম ৯

ওমর ফারুকের চমৎকার অর্জন ৯

অনুপ্রেরণামূলক গল্প ১০

মেয়েটি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল ১০

সঙ্কট থেকে সাফল্যে: জোছনারা খাতুনের অবিশ্বাস্য যাত্রা ১০

ফিকশন ১১

THE 100 TAKA NOTE ১১

প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে-ইউসিবি ১১

প্রবন্ধ ১২

খেলাপি ঋণ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অন্তরায়: প্রয়োজন সুশাসন ১২

অনন্য সেবা ১৩

গ্রাহক সন্তুষ্টির একটি অনুকরণীয় উদাহরণ ১৩

শিল্প-সাহিত্য ১৪

ছোটগল্প ১৪

ধর্ম ১৪

শেষ ফ্লাইটের আগে ১৬

চিঠি ১৮

সূচিপত্র

অনুগল্প ১৯
আহ! ১৯
রম্যগল্প ২০
বাপের মন ২০
কবিতা ২১
এভাবে নয়, ঐভাবে নয় ২১
অন্তর্বর্তী ২১
ভাষা ২১
বৈশাখ বন্দনা ২১
প্রভাতফেরি ২২
কর্মই ধর্ম ২২
ছড়াগুচ্ছ ২৩
কেপিআই ২৩
চাইনিজ ফুড ২৩
ব্যাংকারের জীবন ২৪
মজার ছলে শিক্ষা ২৫
একটা সহজ প্রশ্ন ২৫
ব্যাংকিং কথোপকথন ২৬
একটু হাসি ২৭
এক ২৭
দুই ২৭
তিন ২৭
চার ২৭
পাঁচ ২৮
ইউসিবি ও বাফুফের মধ্যে চুক্তি: হামজার আগমন ২৯

সম্পাদকীয়

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি যখন তার আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নতুন উদ্যমে নির্ধারণ করেছিল, তখন পুরো ব্যাংকিং সেক্টরে নগদ প্রবাহের চাপ এবং আমানতকারীদের মধ্যে অস্থিতিশীলতা বিরাজমান ছিল। এই বৈরী পরিস্থিতির মধ্যেও যখন আমরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করি, তখন সেটি কেবলমাত্র একটি সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের বিষয় ছিল না, বরং ছিল একটি অভূতপূর্ব দুঃসাহসিক যাত্রা। কিন্তু আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্মীদল, কৌশলগত পরিকল্পনা এবং গ্রাহকদের প্রতি অটুট আস্থার সমন্বয়ে আমরা সেই লক্ষ্য অর্জনে সফলতার নতুন মাত্রা যোগ করেছি।

আমরা বহুমুখী কৌশল গ্রহণ করেছি এবং নতুন ও বিদ্যমান গ্রাহকদের জন্য আকর্ষণীয় ডিপোজিট স্কিম চালু করেছি; যার মাধ্যমে আমরা পৌঁছেছি এক অসাধারণ সাফল্যের চূড়ায়। এটি আমাদের ব্যাংকের স্থিতিশীলতা এবং গ্রাহক আস্থার দৃঢ়তম প্রতীক। আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, একসাথে কাজ করার শক্তি এবং পেশাদারিত্ব এই সাফল্যের মূলমন্ত্র। সঠিক নেতৃত্ব এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে যেকোনো চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব— আমাদের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা তা প্রমাণ করেছেন।

'সাফল্যের গল্প—আমরাই পারব' ইউসিবির ইতিহাসে প্রথম ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। আমাদের কর্মকর্তারা তাদের ব্যস্ততার মাঝে সময় করে লিখেছেন তাঁদের কর্মজীবনের নানান অভিজ্ঞতা, সাফল্য, অর্জন এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ। এছাড়াও এ সংকলনে রয়েছে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন জনরার লেখা যেমন— ছোট গল্প, অনুগল্প, কবিতা, ছড়া ইত্যাদি, সাথে রম্য, কার্টুন এবং অন্যান্য সৃজনশীল কাজ। সংকলনটি আমাদের কর্মকর্তাদের সুপ্ত প্রতিভাকে তুলে ধরেছে; যেসব চাপা পড়ে আছে কর্পোরেট জীবনের জাঁতাকলে।

ইউসিবি যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে, তা শুধুমাত্র আর্থিক সূচকের উন্নয়ন নয়; বরং এটি বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের জন্য একটি মাইলফলক। আমাদের এই জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে এবং বিজয়ের মিছিলে আমরা যোগ করব নতুন নতুন মাত্রা— এটাই আমাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য। পথ যত কণ্টকাকীর্ণই হোক না কেন, যদি সঠিক দিকনির্দেশনা অনুযায়ী সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই— আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইউসিবি এক অনন্য উদাহরণ হয়ে ব্যাংকিং খাতের শীর্ষে অবস্থান করবে। ইউসিবি হবে আত্মবিশ্বাসের প্রতীক।

আমাদের ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন 'সাফল্যের গল্প—আমরাই পারব'তে সকলের সৃজনশীল সম্পৃক্ততা প্রত্যাশা করছি।

মাহফুজা রহমান
mahfuza.rahman@ucb.com.bd

আমরাই পারব

সাফল্যের গল্প

২০২৫ সালের প্রথম প্রান্তিকে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি মোট ৩৫৪৮ কোটি টাকা আমানত বৃদ্ধি এবং ১,৭০,০০০টি নতুন হিসাব খোলার উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

এই অসাধারণ অর্জন আমাদের কর্মকর্তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি অগাধ ভালোবাসার স্পষ্ট প্রতিফলন। তাঁদের কর্মোৎসাহ, পেশাদারিত্ব ও দায়িত্ববোধ আমাদের ব্যাংককে আরও শক্তিশালী ভিত্তির দিকে এগিয়ে নিচ্ছে।

এ সাফল্য ভবিষ্যতের বড় লক্ষ্য অর্জনে আমাদের আত্মবিশ্বাস ও প্রেরণা যোগাবে। বিগত কয়েক মাসে ব্যাংকের নিবেদিত কর্মীরা লক্ষ্য অর্জনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমানত সংগ্রহে তৈরি করেছেন উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। এরকম কয়েকটি অনুপ্রেরণামূলক সাফল্যের আমরা গল্প তুলে ধরছি:

পদ নয়, প্রাণের নেতৃত্ব: ইউসিবির নীরব আলোকবর্তিকা

ইউসিবি পরিবারের বুকে কিছু গল্প নিঃশব্দে জন্ম নেয়, যেগুলো হয়তো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে না, কিন্তু আমাদের হৃদয়ে চিরকাল বেঁচে থাকে। এগুলো সেই গল্প, যেখানে পদ-পদবি মুখ্য নয়, মুখ্য হয়ে ওঠে মানুষের মন, দায়িত্ববোধ আর ভালোবাসা।

আজ আমরা এমনই চারজন অসাধারণ সহযোদ্ধার কথা বলছি—যারা দেখিয়ে দিয়েছেন, নেতৃত্ব আসে হৃদয়ের গভীরতা থেকে, comes from the heart, not the hierarchy.

গহিরা শাখার ইকুইপমেন্ট অপারেটর মো. রাশেদ খান তার নিষ্ঠা, ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং দুর্দান্ত যোগাযোগ দক্ষতার মাধ্যমে সংগ্রহ করেছেন ২৯ লাখ টাকার CASA আমানত।

তাঁর কোনো অফিসিয়াল লক্ষ্য ছিল না, ছিল না কোনো বিশেষ সুবিধা; ছিল কেবল এক নিঃশব্দ বিশ্বাস—নিজের জায়গা থেকে কিছু করে দেখাতে হবে। নিজের সীমিত ভূমিকা থেকেও তিনি বুঝেছিলেন, সাফল্য কখনও আসনে নয়, বরং দায়িত্ববোধের গভীরতায় লুকিয়ে থাকে।

একই শাখায় আরেক নীরব যোদ্ধা, সহায়ক কর্মী শেখ ফরিদও লিখে চলেছেন অনন্য সাফল্যের গল্প। কোনো কম্পিউটার ছিল না, কোনো কলম ছিল না, কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশ ছিল না—তবুও তিনি এগিয়ে এসেছিলেন হৃদয়ের টানে।

নিজ উদ্যোগে, মানবিক সম্পর্ক আর গভীর আস্থার মাধ্যমে সংগ্রহ করেছিলেন প্রায় ১৭ লাখ টাকার CASA আমানত। তাঁর ভেতরের একটাই তাগিদ ছিল: 'আমি ইউসিবির একজন, আমাকেও কিছু করে দেখাতে হবে।'

তাঁর গল্প আমাদের শিখিয়েছে—আস্থা তৈরি করতে বড় পদ নয়, দরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতি নিষ্ঠা ও ভালোবাসা।

এই দুই গল্প যখন আমাদের অনুপ্রাণিত করে, তখন রংপুর শাখা থেকে আসে আরেক আলোকবর্তিকা— সহায়ক সদস্য মো. শাহিনুর রহমান।

দৈনন্দিন ছোট ছোট দায়িত্বের মধ্যেও শাহিনুর ভাই দেখিয়েছেন কীভাবে আন্তরিকতা, হাসিমুখ আর মানবিক বন্ধন দিয়ে তৈরি করা যায় ব্যতিক্রমী উদাহরণ। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সংগ্রহ করেছেন ১৫ লাখ টাকার নতুন ফিক্সড ডিপোজিট।

সহায়ক সদস্য হয়েও শাহিনুর ভাই হয়ে উঠেছেন নীরব নেতা—যিনি প্রমাণ করেছেন, নেতৃত্ব মানে কেবল সিদ্ধান্ত নেওয়া নয়, ভালোবাসা দিয়ে প্রতিদিন কাজ করে যাওয়া।

আর এই সোনালি ধারা আরও বিস্তৃত হয়েছে নোয়াপাড়া (চট্টগ্রাম) শাখায়—ডাটা এন্ট্রি অপারেটর রুপন কান্তি বড়ুয়ার মাধ্যমে।

মি. রুপন কান্তি বড়ুয়া দেখিয়েছেন, প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর স্বার্থে নিজ অবস্থান থেকে এগিয়ে আসা কাকে বলে। তিনি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সংগ্রহ করেছেন ৪০ লাখ টাকার নতুন টার্ম ডিপোজিট (TD)।

ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পরিচয়ের বাইরেও তাঁর দায়িত্ববোধ, দূরদৃষ্টি আর ইউসিবির প্রতি অগাধ ভালোবাসা তাঁকে গড়ে তুলেছে অনুপ্রেরণার প্রতীক হিসেবে।

চারটি গল্প, চারটি পথ, কিন্তু মূল সুর একটাই—

নেতৃত্ব আসে ভেতর থেকে। নেতৃত্ব মানে পদ-পদবি নয়, বরং চ্যালেঞ্জ নেয়ার সাহস।

তাদের সাফল্যে আমরা গর্বিত, তাদের পথে আমরা আলোকিত।

অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন নতুন যোগদানকারী খাদিজা

কুমিল্লা ঝাউতলা শাখার অধীন (চান্দিনা উপশাখা) চুক্তিভিত্তিক বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্সিকিউটিভ খাদিজাতুল কোবরা প্রমাণ করেছেন, একাগ্রতা, দৃঢ়তা এবং নিষ্ঠা দিয়ে যে কেউ যেকোনো চ্যালেঞ্জ জয় করতে পারে। নতুন যোগদান করেই খাদিজা সাফল্যের নতুন ইতিহাস রচনা করেছেন। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি সংগ্রহ করেছেন প্রায় ৫০ লাখ টাকার নতুন তহবিল।

খাদিজার ব্যতিক্রমী সাফল্য আমাদের প্রতিটি সদস্যকে একটি শক্তিশালী বার্তা দেয়— এমন কোনো বাঁধা নেই যা আন্তরিক প্রচেষ্টা দিয়ে পার করা সম্ভব নয়। অনেকেই নতুন যোগদান করে কিছু সময় শিখতে কিংবা পরিবেশ বুঝতে ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু খাদিজা খুবই দ্রুত নতুন এক উচ্চতায় পৌঁছেছেন তার স্বতঃস্ফূর্ততা এবং দক্ষতা দিয়ে।

বিশেষ করে, যখন বাজারে প্রতিযোগিতা তুঙ্গে থাকে এবং অন্য ব্যাংকগুলোর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়, তখন খাদিজার অর্জন তার অনন্য দক্ষতা এবং সমঝদারীতার প্রমাণ দেয়। এটি তার কঠোর পরিশ্রম এবং প্রতি পদক্ষেপে ভেতর থেকে আগ্রহের প্রকাশ। খাদিজার সাফল্য শুধু তাঁকে নয়, আমাদের সকল বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্সিকিউটিভকে একটি উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে, যাদের মনোভাব এবং প্রচেষ্টা ব্যবসায় প্রবৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

খাদিজার অর্জনের প্রতিটি মাইলফলক আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, পেশাদারিত্ব এবং অধ্যবসায় মিলিয়ে যে কেউ সফল হতে পারে। খাদিজার অসাধারণ সাফল্য নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং আমাদের সকলকে আরও উচ্চতায় পৌঁছানোর প্রেরণা দিয়েছে।

অভিনন্দন, খাদিজা! আপনার এই অসাধারণ কাজ আমাদের প্রেরণার পথ দেখাবে এবং ব্যাংকিং পেশায় আরও অনেকের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

সমন্বিত উদ্যোগ সফলতার চাবিকাঠি

ওআর নিজাম রোড শাখার কর্মীরা প্রতিদিনের মতোই কাজ করছিলেন— কিন্তু ভেতরে ছিল একটি অদম্য লক্ষ্য, একটি প্রতিজ্ঞা। লক্ষ্য ছিল ব্যাংকের শ্রেণিভুক্ত ঋণ (NPL) কমিয়ে আনা আর প্রতিজ্ঞা ছিল হারানো বিশ্বাস পুনরুদ্ধারের।

১৬ এপ্রিল ২০২৫ শুধু ক্যালেন্ডারের একটি তারিখ নয়, বরং পরিশ্রম আর কৌশলের এক ঐতিহাসিক দিন হয়ে থাকবে। এদিন শাখাটি সফলভাবে মোট ২.৫৭ কোটি টাকা পুনরুদ্ধার করে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ NPL হিসাব থেকে।

এই সাফল্যের পেছনে ছিল সুপরিকল্পিত কৌশল, আর ছিল একদল সহকর্মীর সমন্বিত উদ্যোগ ও নিরলস প্রচেষ্টা।

SAMD এবং শাখা টিম একত্র হয়ে যেভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। প্রতিটি শাখা যদি ওআর নিজাম রোডের অনুসারী হয়ে শ্রেণিভুক্ত ঋণ কমিয়ে আনার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়, তাহলে ব্রাঞ্চগুলো তাদের লক্ষ অর্জনে সক্ষম হবে।

এই পুনরুদ্ধার কেবল একটি আর্থিক সাফল্য নয়— এটি একটি বার্তা: আমরা পারি, যদি আমরা একসাথে থাকি।

এমন অর্জন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কাঠামোকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি ভবিষ্যতের জন্যও তৈরি করে ভরসার ভিত।

শ্রেষ্ঠত্বের পথে নীরব নেতৃত্ব দনিয়া শাখার শামিমা নাসরিন

কিছু সাফল্য অনুভব করতে হয়— প্রেরণায়, প্রতিশ্রুতিতে এবং প্রতিফলনে। ১৭ এপ্রিল ২০২৫, দনিয়া শাখায় এসেছিল এক আনন্দঘন বিজয়ের মুহূর্ত। এদিন কাস্টমার সার্ভিস ম্যানেজার শামিমা নাসরিন একাই সংগ্রহ করেছেন ১ কোটি ১৪ লাখ টাকার CASA আমানত।

এই অর্জনের মাধ্যমে শুধুমাত্র ব্যবসায়িক সাফল্য নয়— তিনি প্রমাণ করেছেন একজন পেশাদার নারীর কঠোর পরিশ্রম এবং দূরদর্শিতা প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে যেতে পারে সাফল্যের চূড়ান্তে। গ্রাহকের সাথে পেশাদারিত্বের মাধ্যমে সুসম্পর্ক বজায় রেখে তিনি এই অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছেন।

একইসাথে, শামিমা নাসরিনের অর্জন নেতৃত্বের গুণাবলি, ধৈর্য এবং উদ্যোগের সম্মিলিত প্রকাশ।

তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে বড় লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপ দেওয়া যায়— আত্মবিশ্বাস, পেশাদারিত্ব এবং মানবিক সংযোগকে পুঁজি করে। তাঁর নীরব অথচ দৃপ্ত নেতৃত্ব কেবল বর্তমানকে আলোকিত করছে না, বরং ভবিষ্যতের পথচলার জন্য একটি প্রেরণার দৃষ্টান্তও স্থাপন করছে।

নিঃশব্দে গড়া সাফল্য: শেখ আবুল বাশারের দৃষ্টান্ত

সব সাফল্যের পেছনে থাকে নীরব, একাগ্র একটি যাত্রা— যা বাইরে থেকে যত সাধারণই মনে হোক, ভেতরে জমা থাকে অধ্যবসায়, নিষ্ঠা আর আত্মবিশ্বাসের গভীর সংকল্প। ঠিক তেমনি একটি দৃষ্টান্ত গড়েছেন দারোগাভিটা আউটলেটের (এজেন্ট ব্যাংকিং) রিলেশনশিপ অফিসার শেখ আবুল বাশার।

২০ এপ্রিল ২০২৫ সাধারণ একটি দিন, কিন্তু ইউসিবির ইতিহাসে এক অসাধারণ সংযোজন। শেখ আবুল বাশার এদিন মোট ৫২ লাখ টাকার সমপরিমাণ CASA আমানত সংগ্রহ করেন। কোনো হইচই ছাড়াই, কোনো করতালির অপেক্ষা না রেখে, তিনি নিজের কাজের মাধ্যমে নিজেকে প্রশংসার দাবিদার করে তোলেন।

এই অর্জন কেবল একটি সংখ্যা নয়, এটি নিষ্ঠার ফল, পেশাগত দক্ষতার প্রতিফলন এবং বিশ্বাসের ভিত্তিতে তৈরি এক নীরব বিপ্লব। শেখ বাশার প্রমাণ করেছেন— যিনি সম্পর্ক গড়েন মন দিয়ে, তাঁর কাছে ব্যাংকিং শুধু পেশা নয়, এটি এক ধরনের সামাজিক দায়িত্বও বটে।

তাঁর এই অর্জন আমাদের এজেন্ট ব্যাংকিং টিমের বৃহত্তর চিত্রকেই তুলে ধরে। যারা শহরের গণ্ডি ছাড়িয়ে গ্রামের ভেতরে ঢুকে মানুষের আস্থায় জায়গা করে নিচ্ছেন।

যারা বিনয়ের সঙ্গে কাজ শুরু করে এখন হয়ে উঠছেন প্রত্যয়ী পথপ্রদর্শক।

দারোগাভিটা আউটলেটের এই গল্প শুধু একটি সাফল্যের কাহিনি নয়— এটি ইউসিবি'র সেই আত্মার গল্প, যেখানে প্রত্যেক পদে কর্মী নয়, সহযাত্রী জন্ম নেয়। যেখানে কাজ দিয়ে নেতৃত্ব আসে, আর প্রতিটি উদাহরণ হয়ে ওঠে নতুন অনুপ্রেরণা।

আমাদের প্রতিটি আউটলেট, প্রতিটি অফিসার তাদের প্রতিশ্রুতি ও পরিশ্রমেই গড়ে তুলছে আগামী দিনের ইউসিবি। শেখ আবুল বাশারের মতো প্রতিটি সাফল্যের গল্প আমাদের শিখিয়ে দেয়— প্রতিটি ব্যক্তিই অমূল্য মানবসম্পদ।

আস্থার ছাউনি গড়লেন সাহাদাত করিম

কিছু কিছু গভীর কিন্তু নিঃশব্দ প্রস্তুতির গল্প আছে— যা চোখে পড়ে না, কিন্তু প্রভাব ফেলে দীর্ঘদিন। এমনই এক নিরলস পরিশ্রমের গল্প আমরা গর্বের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি— এবিডি অঞ্চলের রিলেশনশিপ অফিসার সাহাদাত করিমকে নিয়ে।

কক্সবাজারের প্রত্যন্ত হোয়ানক আউটলেটে থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন ১.১৭ কোটি টাকার CASA আমানত— যা নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রমী অর্জন। এটি কেবল একটি সংখ্যাগত সফলতা নয়, বরং একটি অনুপ্রেরণার গল্প, একটি দূরদৃষ্টির নিদর্শন।

এই অর্জনের পেছনে আছে সাহাদাত করিমের নিজস্ব উদ্যোগ, নিষ্ঠা, ও দায়িত্ববোধ যা তাঁকে গ্রাহকদের সঙ্গে বিশ্বাসের এক অদৃশ্য সেতু গড়তে সাহায্য করেছে।

কোনো প্রচারের আলো ছাড়াই তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, কীভাবে একটি সাধারণ আউটলেটও হয়ে উঠতে পারে অসাধারণ সাফল্যের কেন্দ্রবিন্দু।

এই গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ব্যাংকিং কেবল অর্থের লেনদেন নয়— এটা আস্থা, দূরদৃষ্টি ও দায়িত্বশীলতার একটি মানবিক অধ্যায়। সাহাদাত করিমের অর্জন আমাদের এই বার্তা দেয় যে, একজন ব্যাংকার কেবল হিসাব নয়, সম্পর্কও গড়ে তোলেন। তিনি শুধু আমানত আনেননি, এনেছেন আমাদের ব্যাংকের প্রতি নতুন আস্থার ছাউনি।

যেখানে নিষ্ঠা থাকে, সেখানেই গড়ে ওঠে সাফল্যের নতুন সংজ্ঞা।

যেখানে ঐক্য— সেখানেই অগ্রগতি

প্রতিটি সফল প্রতিষ্ঠান জানে, শুধু সামনে এগিয়ে চলাই যথেষ্ট নয়— পেছনের দায়গুলোকেও দক্ষতার সঙ্গে সামলাতে হয়। দায়মুক্তি সফলতার অন্যতম শর্ত। সফলতার তেমনই এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে ঢাকার বংশাল শাখা।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, বংশাল শাখার একটি দীর্ঘদিনের শ্রেণিকৃত (BL) ঋণ হিসাব হতে মোট ২.৩৫ কোটি টাকা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে আমাদের SAMD টিম এবং বংশাল শাখার সম্মিলিত পরিকল্পনা, দূরদর্শী কৌশল এবং কঠোর পরিশ্রম। শাখাটির এ সাফল্য প্রমাণ করে— যেখানে ঐক্য, সেখানেই অগ্রগতি।

এ ধরনের পুনরুদ্ধার শুধু আর্থিক সাফল্য নয়— এটি আমাদের NPL হ্রাসের অঙ্গীকার এবং KPI-তে 'Rating 1' বজায় রাখার গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। তাই NPL হ্রাসের মাধ্যমে ব্রাঞ্চগুলো নিজেদের সফলতার ধাপে এগিয়ে যেতে পারে আরো অনেকদূর, বংশাল ব্রাঞ্চ সেক্ষেত্রে অনন্য উদাহরণ।

অনুপ্রেরণার উদাহরণ ইবতিদা ফাহিম

আমাদের জীবনে এমন কিছু সাফল্য থাকে—যা বাইরে থেকে হয়তো চোখে পড়ে না, কিন্তু ভেতর থেকে বদলে দেয় পুরো দলকে। বসুন্ধরা শাখার কাস্টমার সার্ভিস অফিসার (ক্যাশ) তেমনই একজন, যিনি প্রমাণ করেছেন— নিজ অবস্থানে থেকেও নেতৃত্ব দেয়া যায়।

ইবতিদা ফাহিম মাত্র একদিনে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ২ কোটি টাকার ফিক্সড ডিপোজিট সংগ্রহ করেছেন। যদিও তিনি সরাসরি ব্যবসায়িক দায়িত্বে নেই, তবুও এই অভাবনীয় সাফল্য তাঁর আন্তরিকতা, উদ্যোগ এবং সংস্থার প্রতি দায়বদ্ধতারই উজ্জ্বল প্রমাণ।

প্রত্যেকে নিজের জায়গা থেকে এগিয়ে এলে প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নেওয়া অনেক সহজ হয়। ইবতিদা ফাহিমের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় এবং সকলের জন্য অনুপ্রেরণার উদাহরণ।

ওমর ফারুকের চমৎকার অর্জন

আমরা গর্বের সঙ্গে স্বীকৃতি জানাই জনাব ওমর ফারুককে, যিনি চৌধুরীহাট শাখার অধীন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সাব-ব্রাঞ্চের প্রধান হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE) থেকে ১.০২ কোটি টাকার রেমিট্যান্স সংগ্রহে সফল হয়েছেন।

এই সাফল্য তাঁর দৃঢ় ক্রস-সেলিং মানসিকতা, গ্রাহককেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কৌশলী উদ্যোগের সরাসরি ফল। তাঁর সময়োপযোগী ক্লায়েন্ট এনগেজমেন্ট, নিবেদন এবং দূরদর্শী পরিকল্পনা আমাদের রেমিট্যান্স পোর্টফোলিওকে আরও শক্তিশালী করেছে এবং ব্যাংকের সামগ্রিক অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

জনাব ওমর ফারুকের অবদান আমাদের সকলের জন্য অনুপ্রেরণাস্বরূপ। আমরা তাঁর এই অর্জনের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

আমরা বিশ্বাস করি, তাঁর এই সফলতা ভবিষ্যতের আরও বৃহত্তর সাফল্যের পথ দেখাবে।

সাফল্যের এ অগ্রযাত্রায় একই ছাতার নিচে কাজ করেছে ইউসিবি স্টক ব্রকারেজ লিমিটেড, ইউসিবি ফিনটেক কোম্পানি লিমিটেড, ইউসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট এবং ইউসিবি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ইউসিবি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড টানা তিন বছর ধরে FinanceAsia কর্তৃক 'Best Investment Bank in Bangladesh' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে!

'ছোট ছোট বালুকণা, বিন্দু বিন্দু জল

গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল'

রবি ঠাকুরের এ অমর বাণীর সূত্র ধরেই বলতে চাই— প্রত্যেকের ছোট ছোট অর্জনই সাফল্যের অঙ্ককে করেছে বিশাল। অবদান যতো ছোটই হোক, কারো অবদানই খাটো করে দেখবার কোনো অবকাশ নেই। প্রত্যেকের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আমাদের লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করছে। এ সংকলনে প্রত্যেকের গল্প তুলে ধরা সম্ভব হয়নি; কিন্তু আমরা আমাদের প্রতিটি সদস্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আমরা আশাবাদী— সাফল্যের এ ধারা অব্যাহত থাকবে দুর্বার গতিতে।

সহযোগিতায়- ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড স্ট্র্যাটিজি ডিভিশন

মেয়েটি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল

বাণী রাণীর জীবন একসময় অন্ধকার সুরঙ্গের মতো মনে হতো। ক্ষুধা, নির্যাতন আর অসহায়ত্ব ছিল তার নিত্যসঙ্গী। স্বামীর হাতের মার, সন্তানদের ক্ষুধার্ত চোখ— এসব সহ্য করতে না পেরে একসময় তিনি আত্মহত্যার কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু আজ সেই বাণী রাণীই হয়ে উঠেছেন একজন সফল নারী উদ্যোক্তা, যার গল্প শুনে শত শত নারী অনুপ্রাণিত হচ্ছেন।

পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলার চন্দনবাড়ি ইউনিয়নের বাসিন্দা বাণী রাণী। এক সময় তার পরিবার রাতের পর রাত কাটাত অনাহারে। স্বামীর রাগ, অভাবের তাড়না— সব মিলিয়ে জীবন হয়ে উঠেছিল অসম্ভব যন্ত্রণার এক উপাখ্যান। কিন্তু আজ তার মুখে হাসি, চিন্তায় ব্যবসার পরিকল্পনা। শুধু নিজের পরিবারই নয়, এখন তিনি আত্মীয়—স্বজনকেও নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে পারেন।

বাণী রাণীর জীবনের বদল শুরু হয় 'উইমেন এন্ডিং হাঙ্গার' সংগঠনের 'কমিউনিটি কিচেন'—এ কাজ করার সময়। সেখানে তিনি অন্যান্য নারীদের কেঁচো সার উৎপাদন করতে দেখেন এবং নিজেও প্রশিক্ষণ নেন। কিন্তু পুঁজির অভাবে এগোতে পারছিলেন না। ঠিক তখনই তিনি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি)—এর 'ভরসার নতুন জানালা' প্রকল্পের সন্ধান পান। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি ৩০ হাজার টাকা অনুদান পান, যা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

এই টাকা দিয়ে তিনি কেঁচো সার উৎপাদনের সরঞ্জাম কিনে নিজের ব্যবসা শুরু করেন। ধীরে ধীরে তার পরিশ্রম ফল দিতে থাকে। আজ তিনি মাসে প্রায় ৫০০ কেজি কেঁচো সার উৎপাদন করেন, যা স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়। উপজেলা প্রাণিসম্পদ ও কৃষি অফিসের সহায়তায় তার ব্যবসা আরও প্রসারিত হয়েছে। স্বামীও এখন তার পাশে দাঁড়িয়েছেন, পরিবারে ফিরেছে সুখ—শান্তি।

কেঁচো সার শুধু বাণী রাণীর জীবনই বদলায়নি, এলাকার কৃষকদের জন্যও এটি একটি কার্যকর সমাধান হয়ে উঠেছে। এই সার ব্যবহার করে কৃষকরা কম খরচে ভালো ফলন পাচ্ছেন। বাণী রাণীর মতো অনেক নারী এখন গোবর ও জৈব বর্জ্য দিয়ে কম্পোস্ট তৈরি করে আয় করছেন, যা স্থানীয় কৃষিকে আরও প্রাকৃতিক ও টেকসই করছে।

বাণী রাণী এখন মাসে ১৫—২০ হাজার টাকা আয় করেন এবং তার প্রায় এক লাখ টাকা সঞ্চয়ও হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমি এখন স্বাবলম্বী। কারো উপর নির্ভর করতে হয় না। ইউসিবির সহায়তা না পেলে হয়তো আজও আমি অন্ধকারেই থাকতাম। তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

তার এই যাত্রা শুধু একটি সাফল্যের গল্প নয়, এটি প্রমাণ করে যে সামান্য সহায়তা আর দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি থাকলে যে কেউ নিজের ভাগ্য বদলে ফেলতে পারে। বাণী রাণীর মতো অসংখ্য নারী আজ স্বপ্ন দেখছেন আত্মনির্ভর হওয়ার, আর সেই স্বপ্নের পথে ইউসিবির মতো প্রতিষ্ঠানগুলো হয়ে উঠছে একেকটি আলোর দিশারি।

সঙ্কট থেকে সাফল্যে: জোছনারা খাতুনের অবিশ্বাস্য যাত্রা

গাজীপুরের এক শান্ত শহরতলিতে জোছনারা খাতুনের জীবন শুরু হয়েছিল সাধারণ গৃহিণী হিসেবে। ২০০৩ সালে আনোয়ার পারভেজের সঙ্গে তার সংসার জীবন শুরুর পর তাদের ঘর আলোকিত করে আসে একমাত্র সন্তান জিশান। ব্যবসায় শিক্ষায় স্নাতক ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও শহরের সীমিত সুযোগ তাকে কখনোই পূর্ণ মাত্রায় স্বাবলম্বী হতে দেয়নি। প্রথমে একটি কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষকতা দিয়ে শুরু করেন তিনি, কিন্তু স্বল্প বেতনে সংসার চালানো ছিল চ্যালেঞ্জিং। পরে আড়ং ডেইরিতে চাকরি নেন, কিন্তু এক দুর্ঘটনায় সেই চাকরিও হারান। যখন আর্থিক সঙ্কট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল, তখনই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন — এবার নিজের পায়ে দাঁড়াবেনই।

স্বপ্নের প্রথম ধাপ: জিশান লেডিজ টেইলার্স

স্বামী ও এক আত্মীয়ের সহায়তায় ২০০৫ সালে বাংলাবাজারের ধনু মোল্লা শপিং সেন্টারে গড়ে তোলেন 'জিশান লেডিজ টেইলার্স অ্যান্ড ফেব্রিক্স'। ছোট্ট একটি দোকান থেকে শুরু করা এই উদ্যোগ ধীরে ধীরে স্থানীয় নারীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু ২০২০ সালে করোনা মহামারি সবকিছু উল্টে দেয়। লকডাউনে দোকান বন্ধ, ক্রেতা কমে যাওয়া, মাসিক ৩০—৪০ হাজার টাকা আয় একেবারে শূন্যে নেমে আসে। ঋণের কিস্তি, সংসারের খরচ— সব মিলিয়ে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। একমাত্র ভরসা ছিল স্বামীর বেতন।

আশার আলো: ইউসিবি'র হাত বাড়িয়ে দেয়া

একদিন ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের ভাওয়াল মির্জাপুর শাখায় টাকা তুলতে গিয়ে তিনি জানতে পারেন নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ইউসিবি বিশেষ ঋণ সুবিধা দিচ্ছে। সেদিনের সেই তথ্যই তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তিনি আবেদন করেন এবং পেয়ে যান ১০ লক্ষ টাকার ঋণ। এটি শুধু টাকা ছিল না— এটি ছিল একটি নতুন জীবনের চাবিকাঠি।

পুনরুত্থান: ছোট দোকান থেকে উদ্যোগের বিস্তার

এই ঋণের অর্থ দিয়ে তিনি নতুন সেলাই মেশিন কিনলেন, কাঁচামালের স্টক বাড়ালেন এবং আরও নারী কর্মী নিয়োগ দিলেন। আজ জিশান লেডিজ টেইলার্স অ্যান্ড ফেব্রিক্স—এ কাজ করছেন একাধিক নারী। শুধু তাই নয়, জোছনারা এখন ফেব্রিক ব্যবসায়ও হাত দিয়েছেন এবং একটি ছোট জমিও কিনেছেন। ভবিষ্যতে তিনি অর্গানিক খাদ্য ব্যবসায় প্রবেশের পরিকল্পনা করছেন।

অনুপ্রেরণার প্রতীক: শুধু ব্যবসায়ী নন, একজন আদর্শ

জোছনারা খাতুন আজ শুধু একজন সফল নারী উদ্যোক্তা নন— তিনি হাজারো নারীর জন্য প্রেরণা। তার গল্প প্রমাণ করে সঙ্কটেই সুযোগ লুকিয়ে থাকে, সঠিক সহায়তা পেলে নারীরা পারেন অসাধ্য সাধন করতে, আর ইউসিবির মতো প্রতিষ্ঠানগুলো নারী উদ্যোক্তাদের স্বপ্ন পূরণে সহায়ক ভূমিকা রাখে। 'ইউসিবি আমাকে শুধু ঋণ দেয়নি, তারা আমাকে আত্মবিশ্বাস দিয়েছে—আমি পারব'— জোছনারা খাতুনের এই কথায় ফুটে উঠেছে তার দৃঢ় প্রত্যয়। তার এই যাত্রা সকল নারীর জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত— যেখানে অসম্ভব বলে কিছু নেই।

সহযোগিতায়- এসএমই এন্ড এগ্রি ব্যাংকিং ডিভিশন

ফিকশন

THE 100 TAKA NOTE

Every day, at exactly 10 AM, an old woman named Rokeya Bibi would walk into UCB. She always carried a small cloth purse, worn out from years of use. She never withdrew large amounts. Instead, she deposited a single 100 taka note—nothing more, nothing less.

The bank officers found it unusual. Why not deposit in bulk? Why every day? One day, curiosity got the better of a young officer, Nusrat. She smiled as Rokeya Bibi approached the counter. 'Amma, can I ask you something?' The old woman nodded kindly. 'Why do you deposit just 100 taka every day?' Rokeya Bibi chuckled softly, 'Because every day, I earn just 100 taka.' Nusrat frowned. 'But Amma, keeping money in the bank is safer. You could deposit weekly or monthly.' The old woman shook her head, 'My son is in college. I promised him that no matter what, I would save something for his future—every single day. If I wait too long, life might get in the way.' She sighed, looking at the note in her wrinkled hand. 'I wash clothes, clean houses. Sometimes I feel too tired to work. But when I think of this note going into his education fund, I find the strength to continue.' Nusrat felt a lump in her throat.

From that day on, every time Rokeya Bibi walked in, the bank staff greeted her with new respect. Years later, she stopped coming. The branch felt her absence. Then, one morning, a young man in a graduation gown stepped into the bank. He approached the counter and placed an old cloth purse on the desk. 'My mother used to come here every day,' he said softly. 'She passed away last month. But before she left, she told me, 'Go to UCB. That's where your future is waiting.' Nusrat opened the account details. The savings were enough for his entire university tuition. The young man wiped his tears. 'She always said she saved little by little. I never knew how much it truly meant.'

That day, as he left the bank, he didn't just carry money. He carried his mother's lifelong sacrifice, turned into his future.

Some deposits aren't just money. They are promises kept.

Anik Islam, Senior Officer
Darus Salam Road Branch

প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে-ইউসিবি

পাকিস্তান পিরিয়ডে একজন সদ্য এম.বি.বি.এস পাস করা তরুণ ডাক্তার পারিবারিক সিদ্ধান্তে তৎকালীন PSC' ক্যাডার নির্বাচিত হয়েও যোগ দিলেন না। জগতে এমন বিচিত্র কত কিছুইতো ঘটে!

সম্পদ-প্রাচুর্যে বেড়ে উঠা সেই তরুণ ডাক্তার সিদ্ধান্ত নিলেন মানুষের সেবা করার, নামমাত্র অথবা ন্যূনতম ভিজিট ফি'র বিনিময়ে। সমাজের প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষদের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন অতি আপনজন।

Old Gypsy Man এর মতো Caravan হাঁকিয়ে সময় চলে যায় তার নিঃসীম গন্তব্যে। কেটে যায় কয়েক যুগ।

২০১৫ এর শুরুর দিকে আমাদের সেই তরুণ ডাক্তার ভদ্রমহোদয় আর তরুণ রইলেন না।

শুভ্র চুলে, শুভ্র পোশাকে, ধীর পায়ে, বহুদিনের ব্যবহৃত ব্রীফকেস হাতে তিনি ঢুকে পড়েন স্নিগ্ধ ঘ্রাণময় একটা কর্পোরেট অফিসে। জাগতিক কাজকর্ম সেরে তিনি মুখ তুলে তাকান এদিক-ওদিক। লেবু দেওয়া চায়ে চুমুক দিয়ে অতি উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিমায় তিনি বলেন— 'ইউসিবি ব্যাংক আমার খুব ভালো লাগে। আপনারা খুব আন্তরিক, হাসিখুশি, প্রাণবন্ত।'

প্রতিবারই তিনি একই একথা একই ভঙ্গিমায় বলে যান।

বিধাতার রাজ্যে ভালো জিনিস অল্প বলেই ভালো। আবার কিছু ভালো কথা বারবার, বেশিবার শুনলেও ক্ষতি নেই। মনে হয় এভাবে বলতে পারায় একটা বিশেষ আনন্দ আছে। প্রথম প্রজন্মের একটা বেসরকারি ব্যাংকের প্রতি কোথায় যেনো তাঁর একটা নিখাদ ভালোবাসা, অপরিসীম দায়বদ্ধতা আছে। আত্মপ্রচারে অনাগ্রহী এমন একটা বৃহৎ পরিসরের বেসরকারি ব্যাংক আবিষ্কার করতে পেরে তিনি বেশ উচ্ছ্বসিত।

পঁচিশ বছর পর, হয়তো কোনো এক বিজ্ঞানী-গবেষক অথবা কোনো প্রকৌশলী,

অথবা কোনো শিল্পপতি, কিংবা কোনো সাহিত্যের অধ্যাপক এমনই কোনো শান্ত নিরিবিলি এক অফিসে বসে গ্রীন টি'র কাপে চুমুক দিয়ে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করবেন হয়তো অন্য কোনো ভঙ্গিমায়।

যুগ থেকে যুগে, অর্থনীতি ও সমাজ ঘনিষ্ঠ এই মিলনায়তনের সৌন্দর্য ও সৌহার্দ্যের

ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেন একঝাঁক তরুণ প্রাণ, আর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ কিছু দিক নির্দেশক-অভিভাবক। যদিও এদের কেউ কেউ স্বপ্ন দেখতেন সুরম্য অট্টালিকার নকশা করতে, কেউ স্বপ্ন দেখতেন 'How time does fly!' বলে ছাত্রদের চমকে দিয়ে শুরু করা কোনো ক্লাসের শিক্ষক হতে, কেউ স্বপ্ন দেখতেন পিকাসো কিংবা ফিদা মকবুল হুসেনের মতো ছবি আঁকতে, কেউ স্বপ্ন দেখতেন আজীবন ফিলিস্তিনের মুক্তিকামী Mahmoud Darwish এর মতো দ্রোহ আর বঞ্চনার কবিতা লিখতে।

স্বপ্নের অধরা-পেশাকে নেপথলিন দেয়া আলমিরায় সযত্নে তুলে রেখে যেসব সুবোধ বালক-বালিকা ইশকুলে আসার মতো পরিপাটি হয়ে কর্মক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়, তারা একেকজন হয়ে উঠেন Holy Keeper of Public Money. দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তির অন্যতম সতর্ক স্টেক হোল্ডার।

'Made in Bangladesh' লেখা পোশাক বা পণ্যবাহী জাহাজ যখন বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে, Los Angeles অথবা Hamburg অথবা Halifax বন্দরে গিয়ে পৌঁছায়, তার বিপরীতে ভিনদেশি যে মুদ্রা এসে আমাদের রিজার্ভ ভারী করে,তার সাথে মিশে থাকে সেই সুবোধ বালক-বালিকাদের মেধা-শ্রম-নিষ্ঠা-তৎপরতা ও ঝুঁকি গ্রহণের মতো নির্বিবাদ মানসিকতা।

দেশীয় শিল্প, সেবা ও বাণিজ্যের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, দেশীয়, ভিনদেশি ও যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগ বাস্তবায়ন ও তরান্বিত করার মাধ্যমে একজন ব্যাংকার অবচেতনে সমাজ ও অর্থনীতিতে যে ভূমিকা পালন করেন; তা পরিসংখ্যান আকারে চলে যায় বিভিন্ন নীতি-নির্ধারণী কর্তৃপক্ষের কাছে। যার নিরিখেই তৈরি হয়, পরিবর্তন হয় প্রয়োজনীয় সকল নীতি, অধ্যাদেশ, এমনকি আইন।

আত্মতৃপ্তি একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্তই সমীচীন। আত্মসমালোচনা ঠিক যেখানটায় গিয়ে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সেখান থেকে মানুষ নতুন করে ভাবতে চায়।

সময়কাল ২০২৫।

আমরা আপাতত আমাদের সেই ডাক্তারের কাছে ফিরে যেতে চাই— যিনি বয়সের ভারে এখন বাইরে বের হন না খুব একটা। তিনি তাঁর উচ্চ মাধ্যমিক পাস করা নাতিকে বোঝাচ্ছেন— তোমার বিদেশের উচ্চশিক্ষায় আমার আপত্তি নেই। কিন্তু, উচ্চশিক্ষা শেষে তুমি অবশ্যই দেশে ফিরে আসবে। এ দেশে অপার সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তোমার জন্য; একে খুঁজে বের করতে হবে।

এদেশে একদল উদ্যমী প্রাণোচ্ছল তরুণ-তরুণী আছে। যাদের আছে সাহস, আত্মবিশ্বাস,আন্তরিকতা আর হাসিমাখা মুখ।

ধোঁয়া উঠা চায়ের কাপের মতো ডাক্তার সাহেবের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে এক মধুর অনন্ত অপেক্ষায়..।

আনমনা হয়ে ওঠা নাতি কিছু একটা জবাব দেয়, উত্তরটা দাদার কানে এসে ঠিক পৌঁছায় না।

মো. জায়িদুল হক, এসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট
জুবিলী রোড ব্রাঞ্চ

প্রবন্ধ

খেলাপি ঋণ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অন্তরায়: প্রয়োজন সুশাসন

যে দেশের ব্যাংক খাত যত বেশি নিয়মতান্ত্রিক, সে দেশ তত সমৃদ্ধ এবং অর্থনীতির চাকা ততো সচল। অথচ আমাদের ব্যাংকিং খাতে বর্তমানে চলমান খেলাপি ঋণ, তারল্য সঙ্কট, গ্রাহকের টাকা ফেরত না দেওয়াসহ নানাবিধ সমস্যা। খেলাপি ঋণ বর্তমানে আমাদের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান সমস্যা, যার কারণে ব্যাংকগুলোর মধ্যে তারল্য সঙ্কট সৃষ্টি হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি, ডলারের অস্থির দাম, রিজার্ভের ঘাটতি, দেশি—বিদেশি ঋণের চাপ বৃদ্ধি, প্রবাসী আয় হ্রাস, রফতানি আয় কমে যাওয়া এবং সর্বশেষ ব্যাংকগুলো থেকে ঋণের নামে অর্থ লুট হওয়ার ফলে ব্যাংকিং খাতে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। খেলাপি ঋণ থেকে মুক্তি পেলেই ব্যাংকিং খাতের প্রায় ৮৫ শতাংশ সমস্যা সমাধান হতে পারে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের শেষে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ২ লাখ ৮৫ হাজার কোটি টাকা, যা ব্যাংকগুলোর মোট ঋণের প্রায় ১৭ শতাংশ। এই পরিমাণে আদালতের স্থগিতাদেশ নেয়া ও অবলোপনকৃত ঋণ যোগ করলে পরিমাণ আরো অনেক বেশি হতে পারে— অনেকে মনে করেন এটি ৬ লাখ কোটি টাকারও বেশি। ২০২৪ সালের তৃতীয় কোয়ার্টারে প্রায় ৭৪ হাজার কোটি টাকা খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে। খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য ব্যাংক আইনগত ব্যবস্থা নেয়, আর সর্বশেষ তথ্যমতে, মার্চ মাসে দেশে প্রায় ৬০টি ব্যাংকের বিরুদ্ধে অর্থঋণ আদালতে ২ লাখ ৭ হাজার ৭৯৩টি মামলা দায়ের হয়েছে।

খেলাপি ঋণের মূল কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ঋণের ঝুঁকি পর্যালোচনার দুর্বলতা, সঠিক কাঠামো মেনে ঋণ প্রদানের অক্ষমতা, ঋণের বিপরীতে কার্যকর জামানতের অভাব, ব্যবসায়ের ক্যাশ ফ্লো না থাকা, ফান্ড ডাইভার্ট করা, ভুয়া ঋণ প্রদান, যাচাই—বাছাই না করা, ব্যবসায়ের প্রবণতা বুঝে না ওঠা, মালিকের ইকুইটি না থাকা ইত্যাদি।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং পদ্ধতিতে অবাধভাবে ঋণ দেওয়া ওভারড্রাফট ব্যবস্থার কারণে অর্থ সরিয়ে নেওয়া খুব সহজ হয়ে পড়ে। এর ফলে অধিকাংশ ঋণ অনিয়মিত ও খেলাপি হয়ে পড়ে। অনেক ব্যবসায়ী ঋণের টাকা সরিয়ে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে দাবি করেন, ব্যাংক ঋণ ছাড়াই অথবা খুব সামান্য ঋণ নিয়ে সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

খেলাপি ঋণের অনুপাত সবচেয়ে কম নেপালে, যেখানে খেলাপি ঋণ মোট ঋণের ৩ দশমিক ৮ শতাংশ। এই হারই বর্তমানে সর্বোচ্চ। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত দেশগুলো হল পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। শ্রীলঙ্কা দেউলিয়া হওয়ার পর ঋণ পুনর্গঠন করছে এবং পাকিস্তানে খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমেছে। পাকিস্তানের অর্থনীতি বর্তমানে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের মূল্যস্ফীতি কমে ৭ দশমিক ২ শতাংশ হয়েছে, যা ২০২৩ সালের মে মাসে ছিল ৪০ শতাংশ।

বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, খেলাপি ঋণের বৃদ্ধি বাংলাদেশের আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে, যার ফলে দেশের উৎপাদনশীল খাতে অর্থায়ন ব্যাহত হচ্ছে। বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহের সঙ্গে দেশের জিডিপির সম্পর্ক রয়েছে, এবং বিশ্বব্যাংক জানিয়েছে, বেসরকারি ঋণপ্রবাহ ১ শতাংশীয় বিন্দু বাড়ালে মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ০.১৩ শতাংশ বাড়বে। বিনিয়োগ বাড়ালে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং মানুষের জীবনমান উন্নত হবে। কিন্তু খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতা হিসেবে গণ্য হবেন তাঁরা, যাঁরা: ১) ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের পরেও তা পরিশোধ করেন না; ২) জালিয়াতি, প্রতারণা বা মিথ্যা তথ্য দিয়ে ঋণ গ্রহণ করেন; ৩) ঋণের

উদ্দেশ্য পরিবর্তন করে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন; ৪) ঋণের বিপরীতে দেয়া জামানত ব্যাংকের অগোচরে অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলেন।

ব্যাংকিং খাতে দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা এবং নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়ার ফলে এই সঙ্কট তৈরি হয়েছে। ব্যবসায়ীরা বিশাল অঙ্কের ঋণ নিয়ে তা আত্মসাৎ করে দেশ থেকে পাচার করছেন এবং বিদেশে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ছেন। যেহেতু ব্যাংকিং খাতের টাকা জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ, তাই এ খাতের দুর্বৃত্তদের কোনো ছাড় দেওয়া উচিত নয়।

খেলাপি ঋণ অনেকটা ক্যান্সারের মতো—এটি যত দ্রুত সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নতুন ঋণ খেলাপি হওয়ার হাত থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে এবং ব্যাংক গ্রাহক নির্বাচনে আরো সচেতন হতে হবে। খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য বিশেষ কমিশন গঠন করা যেতে পারে এবং আইনি প্রক্রিয়া দ্রুত সমাপ্ত করতে ব্যবস্থা নিতে হবে। অর্থঋণ আদালতের পরিসর বাড়িয়ে দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে।

এছাড়া খেলাপি ঋণ আদায়কারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা থাকতে পারে। ঋণগ্রহীতা এবং তার পরিবারের সদস্যদের নতুন কোনো সম্পদ অর্জন থেকে বিরত রাখতে হবে। খেলাপি ঋণগ্রহীতা, তার প্রতিষ্ঠান এবং পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব জব্দ করে তাদের সম্পত্তি ব্যাংকের অনুকূলে হস্তান্তর করা যেতে পারে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলো, যেমন ভিয়েতনাম, ভারত, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া, আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে খেলাপি ঋণ কমিয়ে এনেছে।

বিশ্বের অনেক দেশে ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়। চীন ও ভিয়েতনামে ঋণখেলাপি ও অর্থ আত্মসাৎকারীদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। সিঙ্গাপুরে ঋণখেলাপির জন্য সর্বোচ্চ সাত বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াতেও একই শাস্তি প্রয়োগ করা হয়।

পাওনা ঋণ আদায়ে অর্থঋণ আদালতের শরণাপন্ন হতে পারে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আর ব্যাংক কোম্পানি আইনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকগুলোর ওপর নজরদারি বা ব্যবস্থা নিতে পারে। দেনা পরিশোধে অসমর্থ হলে দেউলিয়া ঘোষণা করা যেতে পারে, যার ফলে ঋণগ্রহীতা আর কোনো আর্থিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারবেন না।

২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে চাইলে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন। ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে পুনরায় সজীব করতে এবং গ্রাহকদের আমানত সুরক্ষিত রাখতে সুশাসন নিশ্চিত করার পাশাপাশি ব্যাংকিং খাতের দুর্নীতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা দূর করতে হবে, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে, ঋণের মনিটরিং করতে হবে, ব্যাংকের পরিচালকদের জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সরকারকে ব্যাংকিং খাতের জন্য প্রণোদনা দিতে হবে।

এছাড়া ব্যাংক খাতে দুর্নীতির দুষ্ট চক্র ভেঙে একটি স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ, সময়োপযোগী এবং জবাবদিহির আওতায় আনা সময়ের দাবি।

মো. মাঈনুদ্দিন, সিনিয়র অফিসার
এলিফ্যান্ট রোড ব্রাঞ্চ

অনন্য সেবা

গ্রাহক সন্তুষ্টির একটি অনুকরণীয় উদাহরণ

একজন ব্যাংক কর্মকর্তা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব শুধু লেনদেন সম্পন্ন করাই নয়, বরং প্রতিটি গ্রাহকের সাথে গভীর আস্থার সম্পর্ক গড়ে তোলা। আমাদের শাখার নিয়মিত গ্রাহক জনাব মো. রফিকুল ইসলামের গল্পটি এই বিশ্বাসকেই আরও সুদৃঢ় করে।

গত শনিবার, ব্যাংক বন্ধ থাকার দিনে জনাব ইসলাম ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অন্য একটি ব্যাংকে কয়েক লাখ টাকা স্থানান্তর করতে গিয়ে দুর্ভাগ্যবশত ভুল একাউন্ট নম্বর প্রবেশ করান। টাকা ভুল একাউন্টে চলে যাওয়ায় তিনি আতঙ্কিত

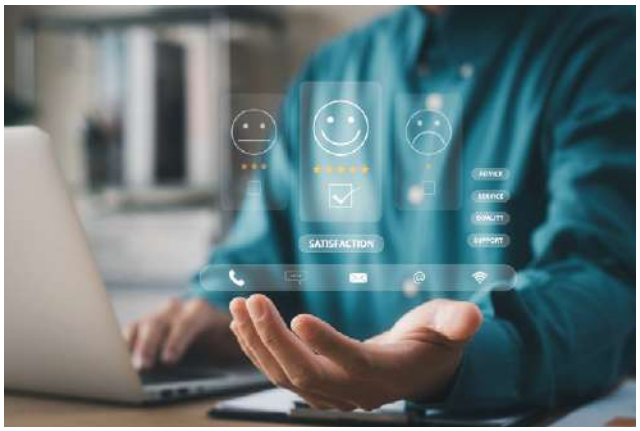

হয়ে পড়েন এবং তাৎক্ষণিকভাবে আমার সাথে যোগাযোগ করেন। যদিও সেটি ছিল আমাদের সাপ্তাহিক ছুটির দিন, তবুও আমি তার সমস্যাটি গুরুত্বের সাথে শুনি এবং তাকে আশ্বস্ত করি যে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো সমস্যার সমাধান করতে।

তিনি এতটাই বিচলিত ছিলেন যে আতঙ্কে ইমেইল পাঠাতে পারছিলেন না। আমি তাকে হোয়াটসঅ্যাপে সমস্ত প্রয়োজনীয় বিবরণী লিখে দিই, যা তিনি আমাদের কাস্টমার সার্ভিসে ফরওয়ার্ড করেন। পরদিন সকালেই কাস্টমার সার্ভিস থেকে প্রতিক্রিয়া আসে যে তারা বিষয়টি তদন্ত করছেন। মধ্যাহ্নের মধ্যেই টাকা তার একাউন্টে জমা হয়।

ঘটনাটির সমাধান পাওয়ার পর জনাব ইসলাম ও তার সহধর্মিণী আবেগপ্রবণ হয়ে আমাদের শাখায় উপস্থিত হন। তার স্ত্রীর কথায় ফুটে উঠেছিল, 'যেখানে সাধারণ কর্মদিবসেও সঠিক সেবা পাওয়া কঠিন, সেখানে ছুটির দিনে একজন ব্যাংক কর্মকর্তার এমন আন্তরিকতা সত্যিই অনন্য। 'তারা আমাদের শাখা ম্যানেজমেন্টের কাছে আমার প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং ব্যাংকের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করেন।

এই অভিজ্ঞতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, গ্রাহক সেবাই ব্যাংকিংয়ের মূল ভিত্তি। প্রতিটি সফল সমাধান শুধু গ্রাহককেই নয়, আমাদের প্রতিষ্ঠানকেও সমৃদ্ধ করে। আমরা বিশ্বাস করি, এমন আন্তরিক সেবাই গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে স্থায়ী বন্ধন তৈরি করে।

তানভীর আহমেদ, অফিসার, সাতারকুল শাখা

ছোটগল্প

ধর্ম

দাদু যে এভাবে চলে যাবেন তা কখনো ভাবতে পারিনি। তার কোনো অসুখ-বিসুখও ছিল না। বয়স আশির কাছাকাছি হলেও তিনি দিব্যি চলাফেরা করতে পারতেন। এবাড়ি-ওবাড়ি ঘুরে ঘুরে লোকজনের খোঁজ-খবর নিতেন। মানুষকে তিনি খুব ভালোবাসতেন। তার কাছে জাতপাতের কোনো ভেদাভেদ ছিল না। তিনি সবার বিপদে-আপদে ছুটে যেতেন। অথচ কত সহজে সকল মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে তিনি এ পৃথিবী থেকে চলে গেলেন। তখন মধ্যরাত, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ দাদুর গলা কানে ভেসে এল। জাভেদ তোরা কে কোথায়? ভূমিকম্প হচ্ছে, ভূমিকম্প! আমাকে ধর! ধর!

চোখে ঘুম ছিল, তবু উঠে গেলাম। ভূমিকম্প? কই? সবই তো ঠিকঠাক আছে।

বুঝতে পারলাম মা-বাবা উঠেছেন এবং তারা দাদুর ঘরে যাচ্ছে। আমিও সেদিকে এগোচ্ছিলাম। আর তখই বাবা মা! মা! বলে চিৎকার করে উঠলেন।

বিছানায় দাদুর নিথর দেহ পড়ে আছে। মা-বাবা উভয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে ফোঁপাচ্ছেন। আমি কিছুই ভেবে উঠতে পারলাম না। এ কী হল? শুধু বাকরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। বাড়ির কাজের লোকেরাও উঠে এল। তারা মা-বাবাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল। মুঠোফোনে রাতেই সর্বত্র খবর পৌঁছে গেল। সূর্যোদয়ের পরপরই আত্মীয়-স্বজন আসতে শুরু করল। আর সেই সাথে হা-হুতাশ বাড়তে লাগল। বিশেষ করে আমার জ্যাঠা যখন তার পরিবারের লোকজন নিয়ে শহর থেকে এসে পৌঁছলেন তখন কান্নার রোল পড়ছিল। নরীরা একে অপরের সাথে গলাগলি করে কেঁদেছে এবং কারো কারো শোকের তীব্রতা এতো বেশি ছিল যে তারা স্থির থাকতে না পেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। তখন পাড়া-পড়শিরাও চোখের পানি ধরে রাখতে পারেনি। ঘর-উঠোন পেরিয়ে কান্নার সুর কাচারিতে গিয়ে পৌঁছেছিল। সেখান থেকে কয়েকজন পুরুষ মুরব্বি বারবার বুঝানোর চেষ্টা করলেন, মুর্দার সামনে উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করা ঠিক না। পারলে দোয়া-দরুদ পড়া উচিত। এরপর ধীরে ধীরে সবাই চৈতন্য ফিরে পেল। চোখের পানি মুছে পরস্পর পরস্পরের কুশলাদি জানলো।

দুপুর বেলায় যখন বাড়ির সবচেয়ে প্রবীণ লোকটিকে কবর দেয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন আরেক দফা কান্নাকাটি হল।

দাফনকার্য সম্পন্ন করার পর সবাই গোসল করে পরিপাটি হয়ে গেল। নারীদের শাড়ির খসখসানি এবং চুড়ির ঝনঝনানি বেড়ে গেল। পুরুষেরা রাজনৈতিক বিতর্কে মেতে উঠল। খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনও চলল হরদমে। তখন আর কোনো শোকের মাতম অবশিষ্ট থাকল না, বরং উৎসবের আমেজ দেখা গেল। এসব কোনোটাই আমার ভালো লাগল না। তাই কদম, কড়ই এবং মাদার গাছের বাগানে এসে বসলাম। অনেকক্ষণ বসে থাকার পরে পিঠের ওপর হঠাৎ হাতের স্পর্শ পেলাম। পিছনের দিকে তাকালাম, দেখি মা। আমি আর চোখের পানি ধরে রাখতে পারলাম না। ডুকরে কেঁদে উঠলাম। মা আমাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, চল বাবা, বাড়ি চল। কারো দাদুই চিরকাল বেঁচে থাকেন না।

সবার খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে এবং বিকাল বেলার চায়ের আয়োজন চলছে। টেবিলে এসে বসলে মা আমাকে ভাত-তরকারি বেড়ে দিলেন। বিদ্যুৎ না থাকায় ফ্যান ঘুরছে না। তবে মা পাশে দাঁড়িয়ে হাত পাখাটা ঘোরাচ্ছেন। তখন আমার জ্যাঠাতো ভাইয়ের বউরা এসে পাশে দাঁড়াল। তাদের একজন বলল, বুড়ো ছেলেকে এখনো আদর করে খাওয়াতে হয়!

ওকে ভাত বেড়ে না দিলে ও খায় না। আজ তো সারাদিন কিছুই খায়নি। আমি এখন ধরে এনে বসালাম। মা বললেন।

বিয়ে করিয়ে দেন, দেখবেন বউয়ের হয়ে অনেক কাজ করবে। তখন আপনাকে আর ধরে এনে ভাত খাওয়াতে হবে না। কথা শেষ করে দুই জা সমস্বরে হেসে উঠলো।

ওদের এ হাসি-তামাশা আমার সহ্য হল না। ক্ষোভের বশে বলে ফেললাম, আমার বড় ভাইয়েরা তোমাদের কথায় ওঠ-বস করলেও সবাইকে এক ভেব না।

দুই জা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

সন্ধ্যার পরে সবাই উঠানে বসল। চাঁদের আলো ছিল। হালকা বাতাসও বইছিল। জ্যাঠা আমাদের পুরনো নকশা করা হাতলওয়ালা চেয়ারটিতে বসলেন। বাবা আরেকটা চেয়ার নিয়ে তার পাশে বসলেন। অন্যরা চেয়ার, টুল ও মোড়া নিয়ে তাদের দিকে মুখ করে বসল। আমি একটু দূরে গিয়ে উঠোনের এক কোণে আমগাছের নিচে আবছা অন্ধকারে বসলাম। কেউ আমাকে দেখতে না পেলেও আমি কিন্তু হারিকেনের জ্বলজ্বল আলোতে সবাইকে দেখতে পেলাম। জ্যাঠা বাবাকে উদ্দেশ করে বললেন, আমার মনে হয় লাখ দুয়েক টাকা হলে হয়ে যাবে। আত্মীয়-স্বজন, এলাকার লোকজন আর এখানকার স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষকদের বলতে হবে, তাই না?

বাবা তার সম্মতি প্রকাশ করে বললেন, হ্যাঁ দাদা, এরকম হলেই হবে।

অন্যরাও মাথা নেড়ে সায় দিলেন। আমি তখন উঠে এসে সবার সামনে দাঁড়ালাম। জ্যাঠা আমার দিকে তাকালেন, তুমি কি কিছু বলবে?

জি।

কী বলবে বল।

এভাবে না করে...

আমি কথা শেষ করতে পারলাম না।

এভাবে না করে মানে? তোমার দাদুর আত্মার শান্তি কামনা করে আমাদেরকে জেয়াফত দিতে হবে না?

না, মানে, বলছিলাম কী...আমি ইতস্তত করলাম। দাদুর আত্মার শান্তি চাইলে টাকাগুলো জেলেপাড়ায় দান করে দেন।

ছি। ছি। ছি। কী যা তা বলছো! মুসলমানদের জেয়াফতের টাকা হিন্দুদের দেব?

ওরাও মানুষ। দাদু ওদেরকে খুব ভালোবাসতেন।

চুপ কর। আমাদেরকে জেয়াফত দিতেই হবে। না দিলে লোকে কী বলবে?

ও! তাহলে দাদুর আত্মা শান্তি পেল কি পেল না সেটা আপনাদের কাছে বড় না, বাহবা পাওয়াটাই মুখ্য উদ্দেশ্য। আমার মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেল। জ্যাঠা উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে গেলেন, চুপ বেয়াদব! ময়-মুরব্বিদের সাথে কীভাবে কথা বলতে হয় তাও শেখেনি।

বাবা উঠে এসে আমাকে ধাক্কা মেরে বললেন, যা এখান থেকে। আর মাকে চোখ রাঙালেন, আশকারা দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছো!

মা আমাকে নিয়ে ঘরের পেছনে চলে এলেন। তিনি নিজের কপালে নিজে থাপড়ালেন, তুই আমাকে আজ মেরে ফেললি। আমার মাথা নিচু করে দিলি। আমি কিছু বললাম না। নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

মা ঘরে চলে গেলে ধীরে ধীরে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলাম। আমাদের বাড়ির অদূরেই হাইস্কুল। পাশে বিরাট দিঘি। দিঘির পাড়ে গাছে হেলান দিয়ে বসলাম। চোখ তুললাম চাঁদের দিকে। আর তখনই দাদুর চেহারাটা আমার সামনে ভেসে উঠল। দাদু আমাকে খুব স্নেহ করতেন। ছোটবেলায় রাতে তার সাথে ঘুমোতে গেলে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প বলতেন। সেসব গল্প শুধু রাক্ষস, খোক্কস কিংবা জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি গল্পের ছলে আমাকে অনেক মানবিক বিষয় শিক্ষা দিতেন। যেমন প্রায় বলতেন, জাভেদ তুই যদি কারো ক্ষতি করিস তাহলে আল্লাহ তোর ক্ষতি করবে। আর মানুষের উপকার করলে তোর বিপদের সময় তা প্রতিদান হিসেবে ফেরত পাবি।

আমাদের বাড়ি থেকে পূর্বদিকে খালের ধারে একটা জেলেপাড়া আছে। কয়েকটি জেলে পরিবার সেখানে বসবাস করে। দাদু প্রায় ওপাড়ায় যেতেন। আমিও একদিন দাদুর সাথে গিয়েছিলাম। দেখলাম দাদুর সাথে ওদের ভালো সম্পর্ক। ওরা দাদুকে কেউ দিদি, কেউ মাসি, কেউ পিসি বলে সম্বোধন করে আপনজনের মতো কথা বলল। দাদু সবার খোঁজ-খবর নিলেন। কাপড়ের খোট থেকে বের করে কয়েকজনকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করলেন। বাড়ি ফেরার সময় রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আমাকে বললেন, সবাই ওদেরকে ঘৃণা করে। আমি বলি মানুষ মানুষকে ঘৃণা করতে পারে না। সারাজীবন ওদের একই অবস্থা দেখলাম। জাভেদ, তুই বড় হয়ে পারলে ওদের অবস্থার উন্নতির জন্য কাজ করিস।

কিন্তু বাড়ি আসার পর বিরাট বিপত্তি বাঁধলো। আমার হাতে সন্দেশ ছিল। মা জানতে চাইলেন এগুলো কোথায় পেয়েছি।

জেলেপাড়া বলতেই মা আমার হাত থেকে ওগুলো কেড়ে নিয়ে উঠোনে কুকুরকে ছুঁড়ে দিলেন। আর আমাকে ধমকালেন, আমাকে না বলে দাদুর সাথে কোথাও যাবে না।

রাতে বাবা বাড়ি এলে মা বাবাকে বিষয়টা জানালেন। তাতে বাবা খুব রেগে গিয়েছিলেন। দাদুকে বললেন, মা, আপনাকে সারাজীবন বলেও কোনো লাভ হয়নি। আপনি ওসব নিচু স্তরের বিধর্মীদের সাথে ওঠা-বসা বন্ধ করতে পারেননি। তবে আমার ছেলেটাকে বিপথে ধাবিত করবেন না। মনে রাখবেন ও হচ্ছে সৈয়দ বংশের সন্তান।

দাদু বাবার সাথে কোনো তর্ক করেননি। শুধু একদিন চুপিচুপি আমাকে বললেন, তোর দাদা থেকে শুরু করে তোর বাপ-জ্যাঠারা কেউই জেলেপাড়ায় আমার যাওয়া-আসা ভালো চোখে দেখেনি। তুই অন্তত সত্যটাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করিস।

ওপর থেকে গাছের কয়েকটা পাতা পড়ল আমার শরীরে। আমি এতক্ষণে চেতনা ফিরে পেলাম। কখন যে দুচোখের পানি গাল বেয়ে বুকে পড়ে গেঞ্জি ভিজে গেছে টের পেলাম না। সত্য উপলব্ধি। কজন সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে? কিংবা এ সমাজও কি সত্যকে উপলব্ধি করতে দেয়? গতরাতে আমাদের বাড়িতে হইচই শুনে জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে বাতি জ্বলে উঠেছিল। ভোর হলে তাদের অনেকে আমাদের বাড়িতে আসতে চেয়েছিল। আমরা তাদেরকে বাড়িতে ঢুকতে দিইনি। রাস্তা থেকে বিদায় করে দিয়েছি। আমরা একবারও ওদের মনের অবস্থাটা বুঝতে চাইনি।

জেয়াফতের আগের দিন বিকালেই আকাশে একটু মেঘ দেখা গেল। রাত বারোটার পর তা বন্ধ হয়ে গেল। তবে আকাশ মেঘে কালো হয়ে একবারে ধুম ধরে গেল। সেই সাথে গরমের মাত্রা গেল বেড়ে। সকাল হলে বিভিন্ন স্থান থেকে মেহমানরা আসতে শুরু করল। সকাল ন'টায় খাওয়া শুরু হবে। সব প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন। মোল্লা সাহেবরা এসে আমাদের সামনের ঘরে বসলেন। এসব আয়োজনে আমি নিজেকে জড়ালাম না। তাই নিজের রুমেই শুয়ে-বসে থাকলাম। হঠাৎ দমকা হাওয়া শুরু হল এবং গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে লাগল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। লোকজন ছুটোছুটি করে ঘর, কাচারি এবং টিনের প্যান্ডেলে গিয়ে আশ্রয় নিল। জানালা দিয়ে দেখলাম একটা পাঁচ-ছয় বছর বয়সী শিশু দৌড়ে এসে ডেলার ওপরে দাঁড়াল। জানালা দিয়ে বৃষ্টির ফোঁটা ঘরে এসে পড়ায় আমি জানালা বন্ধ করতে গেলাম। শিশুটা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। আমি বললাম, তোমার কী হয়েছে?

ও কোনো কথা বললো না। চোখে ভয়ের ছাপ। দরজা খুলে ওর কাছে গেলাম। গায়ে হাত দিতেই অনুভব করলাম সারা শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। বললাম, এসো।

ও নড়ছে না দেখে আমি ওকে কোলে তুলে আমার ঘরে নিয়ে এলাম।

তখন মা এসে আমার খাট ধরে দাঁড়ালেন। বললেন, জাভেদ। ও জেলেপাড়া থেকে এসেছে। পেছনের দরজা দিয়ে গিয়েছিল, আমরা তাড়িয়ে দিয়েছি। আমি মার সাথে কোনো কথা বললাম না। ওর ভেজা কাপড়গুলো খুলে গরম কাথা জড়িয়ে ওকে আমার খাটে শোয়ালাম।

মা আবার বললেন, পাগলামি করিসনে বাবা। আজ তোর দাদুর চেহলাম। আলেম ওলামারা ঘরে।

মা, ওর সেবা করাটাই এখন ধর্ম। আমি দৃঢ়ভাবে বললাম।

কামরুজ্জামান, এক্সিকিউটিভ অফিসার
চাঁদপুর ব্রাঞ্চ

শেষ ফ্লাইটের আগে

রাত প্রায় একটা। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের গেট ৭-এর লাউঞ্জে নাহিয়ান আর সামিয়া পাশাপাশি বসে। সামনের টেবিলে দুটো স্টিম ওঠা আমেরিকানো। ওদের ছেলে আরিশ আর সামিয়ার ভাইয়ের মেয়ে আইশা। দুজনেই কেমব্রিজ স্কুল অব ল'তে যাচ্ছে। একসাথে, একটানা চার বছরের জন্য।

সামিয়া চুপ করে বসে আছে। চোখে গাঢ় চিন্তা। মুখটা অন্ধকার কাচের বাইরে তাকিয়ে। আর নাহিয়ান... সেই পুরনো নাহিয়ান, ঠোঁটের কোণে হালকা হাসি, চোখে অদ্ভুত শান্তি।

'ভেবো না এত। কেমব্রিজে হারায় না কেউ। হারাতে হলে তো অন্তত অক্সফোর্ডে যেতে হয়!'

সামিয়া কুঁচকে তাকালেও হেসে ফেলল। 'তুমি এত মজা কর কী করে, এমন সময়েও?'

'কারণ তুমিই তো একমাত্র মানুষ, যাকে কাঁদতে দেখলে আমি হাসতে চাই না। বরং, কিছু একটা বলে তোমাকে হাসাতে চাই! কিন্তু তুমি আল্লাহর বান্দা সবসময়ই... আচ্ছা থাক।'

সামিয়া একটু চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'ওরা দু'জন এই প্রথম একা থাকছে। আরিশ কিচেনে পানি গরম করতেও জানে না। আইশা তো টোস্ট করতে গিয়ে চুলা জ্বালিয়ে ফেলল একদিন!'

'তুমি ভাবছো ওরা বাচ্চা। আমি তো দেখি এরা আমাদের চেয়েও বেশি ম্যাচিউর। কেবল এখন ওদের শিখতে হবে জীবন কীভাবে ভুল থেকে শেখায়।'

সামিয়া কফির কাপটা হাতে তুলে নিল। একটু চুমুক দিয়ে বলল, জীবন কি সবসময় শেখায় নাকি হারাতেও শেখায়?

নাহিয়ান থেমে গেল। তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'জীবন আমাদের যা দিয়েছে, তার পাশে দাঁড়ালে হারানো কিছুই না। তুমি আছো। আমি তো এই এতটাই চেয়েছিলাম, তুমি আমার পাশে থাকবে। 'সামিয়ার চোখ ছলছল করে উঠল। 'তুমি কী করে জানলে, আমিও তোমাকেই চেয়েছিলাম?'

'কারণ কেউই হঠাৎ করে একটা জীবন একা গড়ে তোলে না। কাউকে না কাউকে মনে মনে রেখেই গড়ে তোলে। আর আমার সেই কেউটা ছিলে তুমিই।' সামিয়া হেসে ফেলল, তবে চোখে জল টলটল করছিল আগের মতোই।

'মনে পড়ে, তখন তুমি ডিফেন্সে যাচ্ছো। সেই শেষ তিনদিনে, আম্মু আমাকে বাইরে যেতে দিত না। আমি শুধু জানলার পর্দা সরিয়ে তোমার ফুটবল খেলা দেখতাম।'

'আর আমি প্রতিদিন পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতাম যদি তুমি একটুখানি জানালার ফাঁক দিয়ে দেখ আমাকে। কখনও দেখেছো কি?'

'হ্যাঁ। প্রতিদিন। কিন্তু চোখের জল মুছতাম, যেন কিছু হয়নি!'

তারা দুজনেই হেসে উঠল। 'তখন মনে হতো, এই প্রেম বুঝি চুপচাপ প্রেম। চিঠি নেই, ছবি নেই, কিন্তু একটা শূন্যতা আছে। আর সেই শূন্যতা শুধু তুমিই পূরণ করতে পার।'

'তুমি বলেছিলে না, তুমি বড় হবে... আমি যেন অপেক্ষা করি?'

'আমি তো শুধু বড় হইনি, তোমার মতো একজনকে জীবনের পাশে পেতে লড়েছিও।'

সামিয়া চোখ নামিয়ে বলল, 'আর এখন ছেলেটা যাচ্ছে... তোমারই মতো দেখতে, হাঁটা-চলা, অভিমান, এমনকি মাথা নুইয়ে বই পড়ার অভ্যেসটাও...'

'আমার সবটুকু সে পায়নি, তার মধ্যে তোমার শান্তি আছে। ওকে যখন জড়িয়ে ধরি, তখন তোমাকেও স্পর্শ করি যেন।'

'আরিশ তো একদিন বলল —আমি যে তোমাদের মতো একটা গল্পের সন্তান, সেটা সবাই জানে।'

'সে সত্যিই গল্পের মতো। ভাবো তো, যদি আমাদের বিয়ে না হতো? যদি সেই পারিবারিক ঝামেলায় হেরে যেতাম?' 'তাহলে আমি হয়তো কাউকে ভালোবাসতাম, কিন্তু ভুলে যেতাম কীভাবে ভালোবাসে।'

একটু চুপচাপ কাটে মুহূর্তটা। বিমানবন্দরের স্পিকারে আবার ঘোষণা। নাহিয়ান দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'জান সামিয়া, তখন যদি সেই সৈন্য জীবনটা বেছে নিতাম, হয়তো দেশের জন্য কিছু করতে পারতাম। কিন্তু নিজের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধটা তো তখনই হেরে যেতাম—তোমাকে নিয়ে বেঁচে থাকার যুদ্ধ।' সামিয়া আলতো করে নাহিয়ানের হাত ধরল।

'তুমি যদি না থাকতে, আমি তো পড়াশোনা ছেড়ে দিতাম। তোমার বিশ্বাসে আমি নিজেকে চিনেছিলাম।'

'তুমি তখন বলেছিলে— তুমি যেটা হতে চাও, সেটা হয়ো। আমি থাকব। শুধু আমাকে পাশে রেখ। সেই একটা বাক্য আমার সব সিদ্ধান্ত বদলে দিয়েছিল।'

'আর এখন? সব পাওয়া গেছে, কী চাই আর?'

'চাই, আরেকটা সকাল, যেটাতে তুমি পাশে থাকো। আর চাই, আমাদের ছেলে যেন শিখে— ভালোবাসা কেবল কবিতা নয়, লড়াইও।'

একটু চুপ করে থেকে সামিয়া বলল, 'ছেলেটা একদিন কাউকে নিয়ে ফিরবে, হয়তো বলতে পারবে না, কিন্তু তার চোখে আমরা যেন দেখি তার বিশ্বাস।'

নাহিয়ান হেসে ফেলে। 'তখন আমরা বলব — বাবা, ভুল করিস না। আমরা যেমন করেছিলাম, তুই একটু কম করিস।'

দুজনে হেসে উঠে, হালকা, স্বস্তির হাসি। ঘোষণায় প্লেন বোর্ডিং শুরু।

'চল একবার গেট পর্যন্ত।' সামিয়া উঠে দাঁড়াল। চোখের কোণ মুছে বলল, যাই। ওরা না দেখলেও আমরা দেখতে যাব। নাহিয়ান সামিয়ার ব্যাগটা কাঁধে তুলে নেয়। 'এই ব্যাগটা এত হালকা হয় কী করে? তুমি তো আমার সব ভার বইছো বছরের পর বছর!'

'তুমি তো আমার জন্যই হালকা হয়ে উঠেছিলে। তুমি পাশে বলেই এত পথ পার করা গেছে।' সামিয়ার মুখে তৃপ্তির হাসি। লাউঞ্জ থেকে বের হয়ে গেটের সামনে দাঁড়াল তারা। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, আরিশ আর আইশা বোর্ডিং পাস দেখিয়ে ঢুকছে।

সামিয়া এক ফাঁকে বলল, 'আমার ভয় করে। যদি ফিরে না আসে?'

নাহিয়ান সামিয়ার কাঁধে হাত রাখে। 'সে ফিরবেই। কারণ তুমি তার জন্য প্রতিদিন অপেক্ষা করবে। আর আমি প্রতিদিন প্রার্থনা করব এই জীবনের সব লড়াই যেন ওর গল্পে না থাকে।'

একটুখানি নীরবতা। সামিয়া আবার ধীরে ধীরে বলল,

'তুমি জানো? আজ এত কিছুর পরেও, আমি যখন ঘুমাতে যাই, শুধু একটা জিনিস ভাবি— ধন্য আমি, কারণ তুমি এখনও ঠিক পাশে আছো।'

হাসে নাহিয়ান।

'আমি তো সেদিনের মতোই ভাবি, আমার স্বপ্ন একটাই ছিল, তুমি। আর তুমি যদি আজও পাশে থাকো, তাহলে আমাদের গল্পটা এখনও চলছে... শেষ হয়নি।'

গোলাম ইয়াজদানী,ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট,
হেড অব ডিজিটাল ব্যাংকিং অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন

চিঠি

প্রথম চিঠিটা অর্পিতাই লিখেছিল। একটা সাপ্তাহিক পত্রিকায় আমার লেখা পড়ে। তার মুগ্ধতার কথা জানিয়ে। অনুরোধ করেছিল লেখালেখিটা চালিয়ে যেতে। বলেছিল পরবর্তী গল্পের জন্য অপেক্ষায় থাকবে। আমাকে তার চিঠির উত্তর দিতে বলেনি। তবু লিখেছিলাম। রাজশাহী মেডিকেল কলেজের পলিন ছাত্রী নিবাসের ঠিকানায়। সেই শুরু। চিঠি লেখা আর পড়া অল্প সময়ে আমার দিনলিপির অনিবার্য অংশ হয়ে উঠল।

চিকিৎসা শাস্ত্রের ছাত্রী হলেও শিল্প-সংস্কৃতিতে অর্পিতার দারুণ আগ্রহ। কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সে উপস্থাপনা করত। আবৃত্তি করত, গান গাইত। দুই ক্ষেত্রেই তার প্রথম পছন্দ রবীন্দ্রনাথ। এদিকে আমি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। তবে বাংলা কাব্য-উপন্যাসেও মজে থাকি। তাই আমার ঘরে শেক্সপিয়ার, মিল্টন, কিটস প্রমুখের পাশে শরৎ, নজরুল কিংবা জীবনানন্দের অনিন্দ্য সহাবস্থান।

অর্পিতার চিঠি আমার জীবনে এক অভূতপূর্ব ঝংকার তুলল। দুপুরের ঘুম উধাও হয়ে গেল ডাক পিয়নের প্রতীক্ষায়, একটা হলুদ খামের জন্য। কত কী যে লিখতাম আমরা! কবিতার কথা, গানের কথা, পূর্ণিমায় ভেসে চলা জীবনের কথা, পথের উপর ছড়িয়ে থাকা বকুল কিংবা কৃষ্ণচূড়ার কথা, রাত্রির একাকিত্বের কথা, এক চিলতে রোদের কথা। আমাদের লেখনিতে বৃষ্টি কখনও সুরের মূর্ছনা, কখনওবা অশ্রু। একজন অদেখা মানুষের সাথে জীবনকে যে কতোভাবে দেখতাম!

আমাদের চিঠি লেখালেখির বছর পেরিয়ে গেলেও সাক্ষাৎ হয় নি। এমনকি ছবির মাধ্যমেও নয়। আমি কয়েকবার ছবি চেয়েছি। কিন্তু অর্পিতা রাজি নয়। আমিও জোর করি নি। বরং কল্পনায় তাকে রাঙিয়ে চলতাম অহর্নিশ। অর্পিতার এক একটা চিঠি পড়তাম আর তার অবয়বটা স্পষ্টতর হতো আমার মানসপটে। এ এক অন্য রকম অনুভূতি। এক মানবীকে সৃষ্টির নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতাম। রাজশাহীতে মানুষের শরীর নিয়ে অধ্যয়নরত তরুণীর হৃদয়ও কি একইভাবে শিহরিত হয়?

এত চিঠি লিখি, এত সহজ সম্পর্ক তবু ভালবাসি কথাটি স্পষ্ট করে বলতে পারছি না। কলম আটকে আসে। শেষে রবি বাবু এগিয়ে এলেন। হাতে গীতবিতান নিয়ে। কোনো এক ভরা পূর্ণিমার রাতে 'আমার পরাণ যাহা চায়' গানটিকে হলুদ খামে বন্দি করলাম। সকাল হতেই ছুটলাম ডাকঘরে, কাঁপা কাঁপা হাতে খামটি লাল বাক্সে পুরে দিলাম। শুরু হল আমার অপেক্ষার পালা। কী উত্তর আসবে? কখন আসবে? না-কি আসবেই না?

মাসখানেক পরে অর্পিতার জবাব পেলাম। সেও কবিগুরুর সাহায্য নিয়েছে। লিখেছে 'আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্ক ভাগী'। আহা, কতবার যে পড়লাম চরণ কয়টি। সেদিনই একটা নীল শাড়ি কিনলাম। বই আর ক্যাসেটের বাইরে

প্রথম উপহার। কুরিয়ার করার আগে কয়েকবার নতুন শাড়ির গন্ধ নিলাম। হৃদয় শিহরিত করা গন্ধ।

সপ্তাহান্তেই অর্পিতার চিঠি হাজির। খাম খুলতেই বিস্ময়ের সীমা রইল না। স্বপ্ন দেখছি না তো? আমি আর অর্পিতা মুখোমুখি। আমার পাঠানো শাড়িটায় তাকে বেশ মানিয়েছে। চোখে গাঢ় কাজল, কপালে কালো টিপ। কী মায়াবী তার চাহনি! এমন চাহনির জন্য তো যুগ যুগ অপেক্ষা করা যায়। কলেজ ক্যাম্পাসে তোলা ছবিটার দিকে চেয়ে রইলাম বহুক্ষণ।

অতঃপর আমাদের ছবি বিনিময় হতে থাকল নিয়মিত। আর বদলে যেতে থাকল চিঠির বিষয়। আমরা এখন একটি ছোট্ট নীড়ের স্বপ্ন দেখি। হাতে হাত রেখে একই পথ চলার স্বপ্ন দেখি। শিশির ভেজা মেঠো পথ, শুকনো পাতা ছড়ানো বুনো পথ কিংবা প্রাণহীন শহরের পিচে ঢাকা নাগরিক পথ। আমরা কখনও জোছনায় ভিজি, কখনওবা বৃষ্টিতে। ঘোরলাগা নয়নে দুজনে তাকিয়ে থাকি বছর তিনেক পরের কোনো এক শুভদিনের জন্য।

সবকিছু ভালোই চলছিল।

চৈত্রের দুপুর। হ্যামলেট পড়তে পড়তে চোখটা লেগে এসেছে। এমন সময় নিচ থেকে হলের লতিফ মামা আমার নাম ধরে ডাকছেন। আমার গেস্ট এসেছে। বেশ অবাক হলাম। মেয়ে সহপাঠীদের সাথে ভালো সম্পর্ক, তবে তারা সাধারণত আমার হলে আসে না। তড়িঘড়ি ভিজিটরস রুমে ঢুকতেই থমকে দাঁড়ালাম। সোফায় যে অর্পিতা! কারো মুখে কথা নেই। দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে আছি। শেষমেশ অর্পিতাই বলল, জরুরি কথা আছে। চল, বাইরে যায়।

হল থেকে বেরিয়েই মল চত্বর। অর্পিতার মুখের কালো মেঘ আমাকে শঙ্কিত করে। আমি কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পাই না।

হাঁটতে হাঁটতে অর্পিতা নিজেই শুরু করে, আমি বাসা থেকে পালিয়ে এসেছি। আগামীকাল আমার গায়ে হলুদ, পরশু বিয়ে। আমেরিকাপ্রবাসী দূর সম্পর্কের খালাতো ভাইয়ের সাথে। গতকালই আমাদের বাসায় বেড়াতে এসে ওরা আমাকে পছন্দ করে। বাবা, মাও রাজি হয়ে যান। মাকে তোমার কথা বলেছি। লাভ হয় নি। রাতভর মনের সাথে যুদ্ধ করে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। বাকিটা তোমার সিদ্ধান্ত।

বজ্রাহতের মত অর্পিতার কথা শুনছিলাম। চকিতে অসুস্থ মা আর অবিবাহিতা বড় বোনের করুণ মুখ মনে পড়ে। ছোট ভাইটি এখনো কলেজে। সবাই আমার দিকে তাকিয়ে। হয়তো বাবাও তাকিয়ে আছেন, পরপার থেকে। আমার পড়াশোনা শেষ হতে আরও বছর দুয়েক লাগবে। অর্পিতারও তাই। এমন সঙ্কটে আমি সাহসী হতে পারি নি। তার হাত ধরে বলতে পারি নি- কোনো ভয় নেই। মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকা প্রেমিকের মনের অবস্থা বুঝতে সময় লাগেনি অর্পিতার। 'বাসায় ফিরে যাচ্ছি, তুমি ভালো থেক' বলেই অর্পিতা অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা রিক্সায় উঠে পড়ে। কোনো নাটকীয়তা না করেই। আমি তার ফিরে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে থাকি। এক সময় ভারী পায়ে হলে ফিরে আসি।

বুকভরা শূন্যতা তখন আমার নিত্যসঙ্গি। চোখে রঙ নেই, হৃদয়ে শিহরণ নেই। আহ্নিক গতির নিয়মে একসময় শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটে। বিসিএস দিই, দিনাজপুর সরকারি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করি।

মায়ের চোখে অপারেশন হয়েছে, ছোট ভাই বুয়েটে পড়ছে, বড় বোন এখন আর একা নয়। চারিদিকে আলোর রেখা, অন্ধকার শুধু আমার অন্তরে। মার্কিন মুল্লুকে অর্পিতা কেমন আছে? সে কি এখনও গান গায়? বৃষ্টিতে ভিজে? অর্পিতার কথা ভাবতে ভাবতে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। মানিব্যাগে রাখা অর্পিতার ছবিটা বের করি। কেটে ছোট করা সেই নীল শাড়ি পড়া ছবি। বাস ছুটে চলেছে টাঙ্গাইলের পথে। আমার নতুন কর্মস্থল। যমুনা পার হতেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। আষাঢ়ের কালো মেঘের বৃষ্টি। রাস্তার পাশের গাছ-পালাও অস্পষ্ট। তবু জানালায় চোখ রাখি। কখন যে ঘুম চলে এসেছিল টের পায় নি। হঠাৎ বিকট শব্দ, প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। মনে হল পৃথিবী উল্টে যাচ্ছে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান ফিরলে টের পেলাম আমি হাসপাতালের বিছানায়। শরীরে তীব্র ব্যথা। মাথায় ব্যান্ডেজ। ভালো করে চোখ খুলতে পারছি না। ডাক্তার এসেছেন। সহকর্মীরা তাকে ঘিরে রয়েছে। কথা শেষে তিনি যখন আমার মুখোমুখি, আমার নাড়ীতে

হাত রেখেছেন, তখন আমার হৃদ স্পন্দন বন্ধ হবার যোগাড়। ঘুম ঘুম চোখেও ডা. অর্পিতা রহমানকে চিনতে অসুবিধা হয় নি। আমি উঠতে চাইলে অর্পিতা হাতের ইশারায় থামিয়ে দিল। মুখে আঙুল দিয়ে কথা বলতে না করল। নার্স ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে গেছে। চেষ্টা করেও অর্পিতার দিকে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে পারলাম না।

সকাল থেকে ঝকঝকে রোদ। অর্পিতা ভোরেই ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। তাকে লন্ডনের ফ্লাইট ধরতে হবে। সেখানে তার দুই বছরের উচ্চতর পড়াশোনা। নার্স জাহানারা আমার সার্বক্ষণিক খেয়াল রাখছে। সুযোগ পেলেই আমার সাথে গল্প করে। জানায় যে অর্পিতার স্বামী-সন্তান নেই, বাবা-মাকে নিয়েই তার সংসার। আমি বেশি কিছু জানতে চাই না, যদিও মনে নানা প্রশ্ন।

আমি জাহানারার কাছে কাগজ আর কলম চাই। একটা চিঠি লিখতে হবে, লন্ডনের কোনো এক হাসপাতালের ঠিকানায়।

মোহা. আহমেদুল হক, ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট
ফাইনান্স ডিভিশন

অনুগল্প

আহ!

সকাল দশটা ত্রিশ। আধঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, সামাইরা এখনো অফিসে আসেনি। ফারহানা রাতে টেক্সট করে রেখেছিলেন যেন দশটার মধ্যে চলে আসে। আগে এলে কাজগুলোও আগেভাগে শেষ করা যায়।

কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতা শুরু হওয়ার পর ব্যাংকের অন্যান্য কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও কাস্টমস খোলা থাকায় কাস্টমারের বিশেষ কলে মাঝেমধ্যে ফরেন ট্রেড ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের আসতে হচ্ছে। চারটা ফ্লোরে প্রায় চল্লিশ জন এমপ্লয়ি নিয়ে সারাদিন অফিস গমগম করত। আর এখন সেই অফিসটাই মনে হচ্ছে ভূতের বাড়ি। একে তো চারজনের কাজ দু'জনে করতে হবে, তার উপর লেট। বিরক্তিতে কপাল কোঁচকালেন ফারহানা। জুনিয়রদের নিয়ে এই এক সমস্যা। যখন-তখন মুড চেঞ্জ হয়। এমনিতে সামাইরা বেশ হাসিখুশি। কাজে ভুল হলে বকাবকি করলেও মন খারাপ করে না; বরং আরো তটস্থ হয়ে কাজ করে। কিন্তু যেদিন মুড অফ থাকে সেদিন আদর করে কথা বললেও কোনো রা নেই। অদ্ভুত ব্যাপারস্যাপার! ফারহানা আনমনে আওড়ালেন।

একটা ফোন করবেন কিনা ভাবছেন তখুনি সামাইরাকে লিফট থেকে নামতে দেখা গেল। তাদের ডিপার্টমেন্ট সেকেন্ড ফ্লোরে। এই ফ্লোরের কেউ সাধারণত লিফট ব্যবহার করেন না। ফার্স্ট ফ্লোরে বায়োমেট্রিক। ফিঙ্গার পাঞ্চ করে ভেতরের সিঁড়ি দিয়ে সেকেন্ড ফ্লোরে চলে আসেন। বায়োমেট্রিক অফ তাই হয়তো সামাইরা লিফটে এসেছে— ভাবলেন ফারহানা। তাছাড়া ওকে বেশ অসুস্থও দেখাচ্ছে। চোখে কাজল নেই, ফ্যাকাসে।

'তোমার শরীর ঠিক আছে তো?'

ফারহানার প্রশ্নের প্রশ্নের উত্তর দিল না সামাইরা। 'কী কী পেন্ডিং আছে ম্যাডাম' বলে পিসির সুইচ চাপল। লেট নিয়েও কোনো কথা বলল না। কাজের প্রেশারে ফারহানাও ঘাটালেন না ওকে। টানা তিন ঘণ্টা দুজনে কাজ করে গেল মোটামুটি নিঃশব্দে। দুইটার দিকে ফারহানার সামনের চেয়ারে এসে বসল সামাইরা। ওকে খুব বিপর্যস্ত লাগছিল। মনে হচ্ছে রাতে ঘুম হয়নি। কিছু জিজ্ঞেস করতে চেয়েও সকালের কথা ভেবে ফারহানা চুপ করে রইলেন।

'লাঞ্চ করবেন না ম্যাডাম?' নিচুস্বরে বলল সামাইরা।

'আমি রোজা আছি। তুমি লাঞ্চ এনেছো?'

'হ্যাঁ, আমি তাহলে ডাইনিংয়ে যাই।'

'ওকে, খেয়ে আসো।'

লাঞ্চবক্স হাতে ডাইনিংয়ের দিকে গেল সামাইরা। ফারহানার ফোন বেজে যাচ্ছিল কিছুক্ষণ ধরে। স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন সামাইরার ফোন। ডাইনিং থেকে আবার কল করছে কেন— ভাবতে ভাবতে ফোন তুললেন ফারহানা।

'হ্যালো.... কে বলছেন?'

আশ্চর্য হলেন ফারহানা। ওপাশে পুরুষ কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে।

'আমি সামাইরার ভাই বলছি। গতরাতে হঠাৎ সামাইরার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। মেডিকেলে নেয়ার আগেই সব শেষ। ডাক্তাররা ভাবছেন করোনা। যদিও ওর কোনো সিম্পটম ছিল না।'

হাত থেকে ফোনসেট পড়ে গেল ফারহানার। শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিম শীতল স্রোত বয়ে গেল। হঠাৎ মনে হল তিনি কোনো অন্ধকার গুহায় আটকে পড়েছেন। বের হবার পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। কান দিয়ে গরম হাওয়া বেরুচ্ছে। কাউকে ডাকবেন তারও কোনো উপায় নেই। মূল গেটে গার্ড ছাড়া পুরো অফিস খালি। ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন ফারহানা।

'ম্যাডাম, আর কী কাজ বাকি আছে? আমাকে দ্রুত যেতে হবে।' পেছন থেকে ফারহানার ঘাড়ের উপর শ্বাস ফেলে হিসহিস করে বলল সামাইরা। ফারহানা ঘাড় ঘুরানোর সুযোগ পেলেন না, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন।

মাহফুজা রহমান (বীথি), অফিসার
এলিফ্যান্ট রোড ব্রাঞ্চ

বাপের মন

আমি আমার মায়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, আজকে আমি আপনাদের ঘর পরিষ্কার করব। ঘর থেকে সব তেলাপোকা ঝেঁটিয়ে বিদায় করব। আলমারি পরিষ্কার করে সব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখব।

আমার মা আমার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,

বাবা যাই করিস না কেন কোনো লাভ নাই। তোর বাবা কোনোভাবেই তোর পছন্দের মেয়ের সঙ্গে তোকে বিয়ে দেবেন না। তুই জানিস তোর বাবা এলাকার প্রেমবিরোধী কমিটির সভাপতি। সারাদিন প্রেম নিয়ে বিচার সালিশ করেন।

কিন্তু আব্বা না প্রেম করে বিয়ে করেছে?

মা মুচকি হাসি দিয়ে বলেন, এখনতো স্বীকার যায় না। কী করবি? আবার তুই পছন্দ করেছিস বরিশালের মেয়ে। তোর আব্বা বলেছে বরিশালের মেয়েকে ছেলের বউ করে ঘরে আনবে না। ঘরের মধ্যে বরিশালের মেয়ে ঘুরে বেড়াবে, কাজের বুয়াদের চিৎকার করে বলবে...ও মনু ডাইলে লবণ দেছো না দেবা? তারপর বলবে...এ মা বাবায় তোমারে বোলায়। মেহমান আসলে জিজ্ঞেস করবে...মনু তোগো বাড়ি কোম্মে?

পাশের থেকে আমার ইবলিশ ছোট ভাই বলল, আম্মু তুমিতো জান না OMG কে বরিশালের লোকজন বলে ও মোর খোদা।

আমি ছোট ভাইয়ের দিকে চোখ কটমট করে তাকালাম। বিড়বিড় করে বললাম, হাতি গর্তে পড়লে চামচিকাও লাথি মারে।

সে এইবার বত্রিশ দাঁত বের করে বলে, যাক অবশেষে স্বীকার করলে তুমি একটা হাতি।

আমি কথা বাড়াই না। বিপদের সময় মুখ বন্ধ রাখতে হয়। আমি আব্বা-আম্মার ঘর গুছাতে শুরু করি। আমার আম্মা আবার বলে,

শুন তুই আবার আলমারিতে তোর বাবার টাকা এদিক-সেদিক করিস না। তোর বাবা যেই কেপ্পন। গতবার আমি তোর ছোট ভাইয়ের বুদ্ধিতে তোর আব্বার ড্রয়ার থেকে টাকা সরিয়ে মনোপলির টাকা রাখছিলাম। সেই ঈদে তোর বাপ আমারে মনোপলির টাকা দিয়ে বলে এই টাকা দিয়ে বাজার কর। বাপজান, যত দুঃখই পাস বাপের পকেটে হাত দিস না। আমি অনলাইনে ড্রেস অর্ডার করছি। তোর বাপ পরে আমারে মনোপলির টাকা ধরায়ে দিবে।

বিকেলে বাপজান আমাকে নিয়ে সালিশে বসেছে। আমি বংশের মান-ইজ্জত ডুবিয়ে প্রেম করে এখন বিয়ে করতে চাচ্ছি এই ব্যাপারে।

সালিশে সদস্য তিনজন। আমার মা প্রথমে একবার এসে এখন আবার সিরিয়াল দেখতে গেছে। আজকের পর্বে নাকি দেখা যাবে শাশুড়ি জিতেছে নাকি বউ? বাবাকে বলে গেছে তোমার ছেলে কিন্তু আজকে অনেক কাজ করেছে। আমাদের রুম পরিস্কার করেছে, আলমারি গুছিয়েছে, ঘর ঝাড়ু দিয়ে ঘর মুছেছে।

আমার বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন,

বাহ তুমিতো দিনে দিনে গৃহভৃত্য হয়ে উঠছো। আমরা কি বাসার বুয়া বিদায় করে দেব? আর তুমিতো রাতের বেলায় জেগেই থাকো। সেই হিসেবে দারোয়ানের চাকরিটাও নিতে পার।

মর্জিনার মা তখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে এক চিৎকার দিয়ে বলে,

খালু আমারে বিদায় কইরেন না। ভাইজান কাজে ফাঁকিবাজ। সকালে ঘুম থেকে উইঠা নাস্তা দিতে পারব না। সেদিন বাজার থাইকা রুই মাছ আইনা কয় মর্জিনার মা পদ্মার ইলিশ আনছি। রান্না কর। পান্তা ভাত দিয়া খামু। খালুজান ভাইজানরে আমি পাশের বাসায় কাজ নিয়া দিমুনে।

আমি দাঁত কটমট করে মর্জিনার মায়ের দিকে তাকালাম।

আমার বাপ আমার দিকে তাকিয়ে বলে, বুঝছো? এইখানেও প্রতিযোগিতা আছে।

আমি এইবার কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলাম।

আব্বা আজকে আলমারি পরিষ্কার করতে গিয়ে আপনার একটা চিঠি পাইছি।

হুম। পাইবাইতো। সেই আমলে আমরা বাবা-মা'কে চিঠি লিখতাম। টাকা পাঠাইতাম। বসে বসে বাপের টাকায় প্রেম করতাম না। কী যে ভালো ছেলে ছিলাম। মেয়েরা যে রাস্তায় হাঁটতো সেই রাস্তায় আমরা হাঁটতাম না। কার কাছে চিঠি লিখেছিলাম? বাপের কাছে, না মায়ের কাছে?

না আব্বা। আপনি চিঠি দিয়েছেন ময়না পাখিকে। চিঠির ভেতরে লিখেছেন ময়না পাখি পুকুর পাড়ে আসলে আপনি কাঠাল গাছের উপর থেকে পাখিকে একটু দেখবেন। কাঠালের বীচির সঙ্গে চিঠি বেঁধে ময়না পাখিকে ছুঁড়ে মারবেন। বাসার লোকজন বিয়েতে রাজি না হলে পাখি নিয়ে উড়াল দিবেন। নীচে আপনার স্বাক্ষর।

বাপজান একটু নড়েচড়ে বসলেন।

আব্বা আমি বলছিলাম কী, আপনার এই যে পাখিপ্রীতি এটাতো কেউ জানে না। ভাবলাম এই চিঠি ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে সবাই একটু জানালাম পাখির প্রতি আপনার ভালোবাসা। জাহাঙ্গীরনগরে যে পাখিমেলা হয় সেখানে আপনাকে প্রধান অতিথি করে নিয়ে গেলাম।

এরমধ্যে মা এসেছে।

কী ব্যাপার তুমি চুপ করে আছো কেন? ছেলেকে বুঝিয়েছো যে এই বিয়েতে তুমি রাজি না?

কে বলছে আমি রাজি না? দেখো, ছেলে সাবালক হইছে তাকে বিয়ে দিতে হবে। ছেলে মেয়ে পছন্দ করছে, আলহামদুলিল্লাহ!

বললা না বরিশালের মেয়ে তোমার ছেলেরে বলবে, তোমার বাফে তোমারে বোলাইতে লাগজে। ছ্যাঁৎ কইররা যাও।

বরিশালের ভাষা এবং সেখানকার লোকজন সবচাইতে মিষ্টি। ভাবছি বউমার কাছ থেকে বরিশালের ভাষাটা শিখবো। আমিও তোমাকে বলব, ও মনু ডাইলে লবণ দেছো নাকি দেবা?

আমার মা হা করে বাবাকে দেখছে।

তোমার শরীর খারাপ করে নাইতো?

আর শুনো, ছেলেকে দিয়ে ঘরদোর পরিস্কার করাবা না। এতে বিরাট সমস্যা হয়। আমি ছেলের দ্রুত বিয়ের ব্যবস্থা করছি। ধর্মে আছে সাবালক ছেলের যত দ্রুত বিয়ে দেয়া যায় ততই মঙ্গল।

বাবা উঠে তার রুমে যাচ্ছেন।

মা আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন, কিরে, তুইতো হিন্দি সিরিয়াল থেকে কম যাস না। একদিন ঘরদোর পরিষ্কার করে বাপের মন জিতে নিছিস!

মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, ভাইস প্রেসিডেন্ট
কর্পোরেট ব্যাংকিং ডিভিশন

কবিতা

এভাবে নয়, ঐভাবে নয়

এভাবে তাকাতে নেই, এভাবে তাকালে হব দুরন্ত বাতাস
ছুঁয়ে দিয়ে চুল, চিবুকের তিল হয়ে যাব শীতের শিশির
ঐভাবে তাকাতে নেই, তাকালে কম্পিত হবে হৃদয়ের ভূমি
সাগরের ঢেউ হয়ে ভেজাব তোমার কোমল পা
আকাশের নীল থেকে রঙ তুলে এঁকে দেব টিপ
তোমার নামেই সন্ধ্যাবেলা জ্বালাব প্রদীপ
এমন হাসতে হয় না, এভাবে হাসলেই ম্লান হবে পাখিদের কলতান
ঠোঁটের গোলাপী রঙে হিংসুটে হবে সব ফুল
এভাবে তাকাতে নেই, হাসতে নেই—
তুমি হাসলে চেয়ে থাকে অপলক চোখ
ঐভাবে তাকালে খুন হই প্রতিবার।

নাহিদ আনসারী, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার
সার্ভিস কোয়ালিটি ডিভিশন

ভাষা

ক্ষুধার অনুবাদ করবো বলে
আত্মস্থ করতে পাখিদের ভাষা
আকাশকে সঙ্গী করে
ধ্যানী হয়ে বসে আছি
পাতালের খুব কাছাকাছি।
জানালায় চোখ, চোখ ভেসে যায়
ঝরছে পাতা, কাঁদে কি বৃক্ষ?
ইথারে জমেছে অযুত কথা
গুম মেরে আছে অন্তরীক্ষ।

মোহাম্মদ সেলিম, অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট
(অপারেশন ম্যানেজার), নাজিরহাট ব্রাঞ্চ, চট্টগ্রাম

অন্তর্বর্তী

এই অন্তর্বর্তীকাল সময় আমরা হয়তো মনে রাখব না
আমাদের নতুন প্রেম হবে
নতুন স্বভাবে-শরীরে
ভুলে যাব এইসব নিদ্রাহীন ঘুঘু ডাকা রাত
তারপর আবার হৃদয়ে জমবে অনভিপ্রেত পলি
আবার যুদ্ধ হবে, বিগ্রহ হবে
আর আমরা চেষ্টা করতে থাকব শান্তিচুক্তির
কেননা— 'মানুষ যদিও বিরহকামী, কিন্তু তার মিলনই মৌলিক'

মিলনের নেশা ফ্যাসিস্ট রেজিমের মতোন
উস্কে দিচ্ছে সময়ের আবহাওয়া
পতিত হতে হতেও টিকে থাকতে চায়
অদৃশ্য যাদুশক্তির প্রয়োগে
কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী—
যতোই দিক আত্মরক্ষার হিংস্র ব্যারিকেড
নার্সিস্টিট প্রেমিকের পতন অবধারিত
আমিও তাই হাসিমুখে জানাই অভিবাদন

আমার আর নারাজির কীই-বা আছে
যখন স্বয়ং রাষ্ট্রই সঙ্গ দিচ্ছে
আমাদের অন্তর্বর্তীকালে!

মাহফুজা রহমান (বীথি), অফিসার
এলিফ্যান্ট রোড ব্রাঞ্চ

বৈশাখ বন্দনা

এলো এলো এলো বৈশাখ
যা কিছু নতুন, গাই তারই গান
পুরনো যা পিছে পড়ে থাক।।

প্রাণে প্রাণ মিশি বাজিল বাঁশি
দুঃখ-জরা ঘুচিয়া আসিল হাসি,
আনন্দ মেলাতে, ভালবাসা বিলাতে
মনে প্রাণে জাগে আনুরাগ।।

চৈত্রের খরতাপে পুড়িল ধরা
নতুনের আহ্বানে জাগিল সাড়া।

সত্য সুন্দর মঙ্গলময়
আগামীর দিনগুলো তাই যেন হয়!
সব কালো ঘুচাতে, নতুন এ প্রভাতে
নব রবি আলোক ছড়াক।।

মো. সারোয়ার আলম, এফভিপি
মুন্সিগঞ্জ ব্রাঞ্চ

প্রভাতফেরি

সোনালী কাবিন রইল পড়ে ঠিকই
অস্তগত তিতাস পাড়ের রবি,
কালের কলস অবুঝ সমীকরণ
চলে গেছেন নোলকহারা কবি।

আয়শার চুল খোলা আছে আজও
কেউ রবে না পাতার আগুন ঘিরে,
না ঘুমানো পাখির দলও আছে
কবিই কেবল আসবে না আর ফিরে।

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ এলে
বাজবে ঠিকই প্রভাতফেরির গান,
পাখির কথায় ডানা মেলে মেলে
উড়বে না আর কবির মন ও প্রাণ।

সাদা হলুদ মল্লিকা ফুল হাতে
জেলগেটে কেউ বসে কি আর রবে?
দেশের কাঁপন, মাটির কাঁপন বুঝে
এমন কবির জন্ম কি আর হবে!

দেখবে কে আর জ্যান্ত পাখির ঠোঁটে
মুছে যাওয়া হিম বাতাসের ফেনা,
ডাকবে কে আর- হে মতিয়ুর উঠ;
কে শোধাবে ক্লান্ত জাতির দেনা।

মো. নাজমুল আলম নাছির, শ্রীপুর উপশাখা, নবীনগর ব্রাঞ্চ, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্সিকিউটিভ

কর্মই ধর্ম

অটল ধরা সারগর্ভ তম শবরী
কিঞ্চিৎ প্রভাতে দীপ্তমান করবী

ললাটে কী হয় বল? 'কর্মই যে ধর্ম'
বরেণ্যরা বুঝে না জাতি কিংবা বর্ণ

পরমেশ সবারই কজনার নয়
তবে কেন অপযশ কর অতিশয়

দিবাকর উল্লোসিত আলো দিতে পেরে
আকাশটা মুক্ত দেখ জল ঝেরে ঝেরে

এমনও আছে যেজন একাহারী
এমনও আছে যারা চলে মাধুকরী

ক্ষণিকের জনমে সবাই ক্ষণজন্মা
তাই বলে ধরাতে কেউ কারো পর না

পরোপকার করে তুই হ আজ ধন্য
দেখবি বিধাতা তোরে দেবে কত পুণ্য।

শোয়েব মাহমুদ, সিনিয়র অফিসার (ক্যাশ)
লক্ষ্মীপুর ব্রাঞ্চ

ছড়াগুচ্ছ

কেপিআই

অফিসে রোজ
কাজের চাপে
ওষ্ঠাগত প্রাণ,
তবুও বস নিত্য বলে
আন ডিপোজিট আন।

বস এর কথা
যায় না ফেলা তাই,
টাকার খোঁজে
পবন বেগে
এদিক-ওদিক যাই।

আনলে টাকা
হয় না তবু ক্ষান্ত,
বলে এবার
এসএমই লোন আনতো !

লোন আনাটা সহজ তবু
ডিপোজিট এর চেয়ে,
চিন্তা শুধু ঋণের টাকা
ফেরত পাওয়া নিয়ে!

ঋণখেলাপি
যদি বেড়ে যায়,
নিতে হবে
রিকভারির দায়।

এরপরে বস
বলে আমি চাই,
গ্রাহক সেবা দিতে হবে
সবার সেরাটাই।

সকল কিছুই অকপটে
করি আমি ভাই,
কেপিআই'য়ে বেস্ট রেটিং
যদি মেলে তাই।

চাইনিজ ফুড

(এক পথশিশুকে প্রশ্ন করেছিলাম, তোমার প্রিয় খাবার কী? উত্তরে সে বলল, চাইনিজ ফুড। অবাক হয়ে আবার প্রশ্ন করলাম, জীবনে কয়বার খেয়েছ? সে বলল, কখনোই খাই নাই, টাকা জমাইতেছি, কিছুদিন পরেই খাব। তার সাথে আরো কিছুক্ষণ কথা হয়েছিল। তাকে নিয়েই আজকের এই ছড়া)

চাইনিজ ফুড নাকি
খেতে ভারি মজা,
বলেছিল আমাকে
বুলবুল দাদা।

ঘ্রাণে নাকি ক্ষণিকেই,
জিভে আসে জল,
খেলে নাকি দেহতেও
পাওয়া যায় বল।

তবে ভাই দামটা যে
খুব বেশি চড়া,
দাম দেখলেই হয়
চোখ ছানাবড়া।

তবু আমি একদিন
চাইনিজে যাব,
দাম যাই হোক আমি
পেটভরে খাব।

ভালো জামা জুতো আর
জিন্স প্যান্ট পরে,
চাইনিজে যাব আমি
ট্যাক্সিতে চড়ে।

কাওরান বাজারে
সবজির ঝুড়ি,
আনা-নেওয়া করে রোজ
বেশ আয় করি।

টাকা আমি জমাচ্ছি
তিন মাস ধরে,
তবে সেটা বাড়ছে
খুব ধীরে ধীরে।

আরও কিছুদিন যদি
জমাতে পারি,
হয়ে যাবে টাকা মোর
ঠিক বিশ কুড়ি।
আমার প্রিয় ফুড
চাইনিজ ফুড,
খেয়ে আমি বলব
গুড ভেরি গুড।

কাজী মোহাম্মদ মোসলেহ উদ্দিন, ভাইস প্রেসিডেন্ট
ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড স্ট্রাটেজি ডিভিশন

ব্যাংকারের জীবন

অর্থের স্রোতে
প্রতিদিন যায় তার
সে যে মহা ব্যস্ত
এক ব্যাংকার।

গোনাগুনি করে কেটে
যায় সারাবেলা,
হিসাবের খাতায়
লেখা থাকে মেলা।

ঋণ-আমানত আর
চেকের পাহাড়,
সার্ভিস দিতে গিয়ে
জল হয় হাড়।

এক পাশে বসে
ক্রেডিট টিম,
ঋণের ফাইলে
গবেষণা প্রতিদিন।

অন্যপাশে আছে
ক্যাশ কাউন্টার
টাকা দেওয়া-নেওয়া কাজ
তাদের সবার।

শেয়ার বাজার আর
সুদের হিসাব,
বিনিয়োগ নিয়ে
আছে ভাবনার চাপ।

সন্ধ্যা হলে যদি
হিসাব মেলে,
ক্লান্ত দেহে সে
ঘরে ফিরে চলে।

ব্যাংকারের জীবন
ব্যস্ততায় ভরা,
তবু এতে আছে
সুখের ধারা।

অর্থের সেবা আর
অর্থের বাণী,
গড়ে তোলে
দেশের কল্পনাখানি।

ইয়াসিন জাফর আসিফ, এক্সিকিউটিভ অফিসার
পেমেন্ট সার্ভিস ডিভিশন

মজার ছলে শিক্ষা

একটা সহজ প্রশ্ন

আলুভর্তি সমান সাইজের দুটো ঝুড়ি A ও B। ঝুড়ি A তে ২০টা আলুর ২টা নষ্ট, ঝুড়ি B তে ২০০ আলুর ২০টা নষ্ট। কোন ঝুঁড়ি থেকে বেশি দুর্গন্ধ ছড়াবে?

উত্তর পরে দিই, তার আগে কিছু ত্যানা প্যাঁচাই। আমরা যারা ঢাকাবাসী তাদের হাজারো সমস্যা যেমন ট্রাফিক জ্যাম, পানির সঙ্কট, গ্যাস সঙ্কট , জলাবদ্ধতা, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ইত্যাদি নিয়ে বসবাস। আমরা কথায় কথায় উন্নত বিশ্বের উন্নত শহর যেমন সিঙ্গাপুর, নিউইয়র্ক, টোকিও, কুয়ালালামপুর ইত্যাদির সিস্টেম এবং সুযোগ-সুবিধা নিয়ে তুলনা করে আমাদের মেয়র, প্রশাসন কিংবা সরকারকে গালাগাল দিয়ে আলোচনা শেষ করি। প্রাণের শহর ঢাকায় এখন লোকসংখ্যা ২ কোটির বেশি। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যা যেখানে অন্যান্য উন্নত শহর যেমন সিঙ্গাপুরে ৮ হাজার, টোকিওতে ৬ হাজার ২শ, সিউলে ১৬ হাজার ৫শ, কুয়ালালামপুরে ৬ হাজার ৮শ, মস্কোতে ৮ হাজার ৫শ, ক্যানবেরায় ৪৭০ ও নিউইয়র্কে ২৬০ জন, সেখানে যাদুর শহর ঢাকায় প্রায় ৫০ হাজার !

এখন কথা হলো, এতো মানুষ কিন্তু ঢাকায় রঙিন আলো দেখতে আসেননি। বড়ো ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে রিকশাওয়ালা, নরসুন্দর ইত্যাদি সব পেশার লোকজন জীবিকার তাগিদে ঢাকায়। ঢাকাকে কেন্দ্র করে লাখো পরিবার চলছে, লাখো লোক অবিরত প্রতিদিন যুক্ত হচ্ছে তাদের ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে।

একটি আদর্শ শহরের আয়তনের ২৫% রাস্তার জন্য থাকতে হয়, সেখানে ঢাকায় মাত্র ৭%, এর সাথে প্রায় ১৫ লাখ মোটরযান আর ৭ লাখ রিকশা, যাকে বলে মরার উপর খাঁড়ার ঘা। ঢাকায় যানবাহনের গড় গতি ঘণ্টায় ৫ কিলোমিটার, হাঁটার গতির চেয়ে কম। এরপরে আসি রাস্তাঘাটে শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত ট্রাফিক পুলিশে। মাত্র ৪ হাজার পুলিশ নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে চলছে ট্রাফিক পুলিশ। যানবাহনের ফিটনেস সার্টিফিকেট, লাইসেন্স, রোড পারমিট ইত্যাদি দেয়াসহ দেশের পরিবহন কর্তৃপক্ষের অবস্থা আরো করুণ। সারাদেশের প্রায় ৪৫ লাখ রেজিস্ট্রার্ড যানবাহন আর ২৮ লাখ ড্রাইভিং লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিভিন্ন সেবায় নিয়োজিত বিআরটিএ'র লোকবল মোটের উপর মাত্র ৭০৮ জন, যার মধ্যে ইন্সপেক্টর আছেন মাত্র ১০৯ জন। সিটি কর্পোরেশনও একইরকম। দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নাকি মাত্র ৩৮% লোকবল নিয়ে চলছে, উত্তরেও একই হাল। যদিও আমাদের জাতীয় বাজেটে জনপ্রশাসন খাতে ব্যয় অন্যান্য সকল খাতের চেয়ে বেশি, সর্বোচ্চ ১৮.৫%। কারণ একটাই— লোক বেশি, সম্পদ কম।

এতো এতো ঘাটতির পরেও এতো বেশি নাগরিকে ঠাসা ঢাকা খুঁড়িয়ে হোক আর যেভাবেই হোক এখনো চলছে সেটাই কম কিসে? শুধু চলছেই না, দেশের জিডিপি'র ৩৫% কন্ট্রিবিউশান ঢাকার।

প্রশাসনকে তাই বলে তুলসীপাতা বলা যাবে না। শহরে বিভিন্ন ধরনের সেবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দেয় যেমন বিআরটিএ, সিটি কর্পোরেশন, ট্রাফিক পুলিশ, রাজউক, বিটিসিএল, ওয়াসা, ডিপিডিসি ইত্যাদি। এদের সমন্বয়হীনতায় অনেক সময় দুর্ভোগ বাড়ে। রাস্তার দায়িত্ব বিআরটিএ, ট্রাফিক পুলিশের হলেও ফুটপাতের দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশনের। লেক বা ঝিলের দায়িত্ব রাজউকের হলেও ড্রেনেজ সিস্টেমের দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশনের। একই রাস্তায় একদিন ওয়াসার কাজে খোঁড়াখুঁড়ি হয়, তো আরেকদিন তিতাসের কাজে। এছাড়া সবকিছু ঢাকাকেন্দ্রিক না করে বিকেন্দ্রীকরণের কোনো উদ্যোগ নাই। একদিকে সীমিত লোকবল ও সমন্বয়হীনতা, তারপর আবার কিছু আছে দুর্নীতিবাজ। উল্লেখ্য, সবাই দুর্নীতিবাজ না, নইলে এদেশ এতোটা অপ্রতুলতার মধ্যেও চলতে পারতো না।

লেখা অনেক হয়ে যাচ্ছে, প্রশ্নের উত্তর খোঁজা উচিত। আমরা যদি দুষ্টু লোক যারা আইন অমান্য করে, দুর্নীতি করে এমন লোকের পার্সেন্টেজ করি; ধরি ১০%, তাতে আমার ঢাকা শহরেই দুষ্টু লোকের সংখ্যা হবে ২০ লাখ যারা বিভিন্নভাবে ঢাকায় বসবাসের জন্য। বাকি ৯০% নাগরিকদের জন্য বিপদজনক। ঢাকার আয়তন কিন্তু বেশি না, মাত্র ৩০৬ বর্গ কিলোমিটার, কিন্তু দুষ্কৃতকারী বহু। এদেরকে আটকানোর জন্য বহু আইন ঠিকই আছে, কিন্তু মনিটরিং-এর জন্য আইন প্রয়োগকারীর সংখ্যা খুবই কম। দেশে পার ক্যাপিটা পুলিশ প্রায় ৮০০, অর্থাৎ প্রতি ৮০০ লোকের জন্য ১ জন পুলিশ। যেখানে সিঙ্গাপুরে ১৪০, মালয়েশিয়ায় ৩০০, আমেরিকায় ৩৩০, ভারতে ৬৫০ আর পাকিস্তানে ৫৫০ জন। কিছু লোক পারিবারিক শিক্ষা, একাডেমিক শিক্ষা, বা অন্যসব শিক্ষা না পেয়েও শুধু সামাজিক শিক্ষা নিয়েই সভ্য হয়। আর কিছু লোক পৃথিবীর সব শিক্ষা নিয়েও অসভ্যই থাকে। এদেরকে সভ্য করতেই প্রয়োজন কঠোর মনিটরিং। সিঙ্গাপুর, দুবাই ইত্যাদি যেকোনো উন্নত শহরে রাস্তায় থুতু ফেললে, যেখানে সেখানে গাড়ি পার্কিং, রাস্তা পারাপার হলে শতডলার জরিমানা দিতে হয়। যারা সভ্য তারাতো করেই না , এমনকি যারা অসভ্য তারাও জরিমানার ভয়ে হলেও আইন অমান্য করে না কারণ তারা জানে যে সেখানে মনিটরিং খুব স্ট্রং।

ঢাকার জনসংখ্যা যদি ২০০ লাখ না হয়ে ২০ লাখ হতো তাহলে কী হতো?

থাক, আর ত্যানা প্যাঁচাবো না, উত্তর হবে B.

মো. নাসিম হাসান, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার
অ্যাসেট অপারেশন ডিভিশন

ব্যাংকিং কথোপকথন

দুজন কলিগের মধ্যে আলাপ:

: আপা লাঞ্চে গেলাম, এইদিকটা একটু দেইখেন।

: ভাইজান, এখন বিকাল ৫টা বাজে, ইভিনিং স্ন্যাক্স বলেন!

শিক্ষা: সময় কারো জন্য থেমে থাকে না।

ওয়াকিং কাস্টমারের আলাপ:

ব্যাংক কর্মকর্তা: স্যার, কিভাবে সাহায্য করতে পারি?

: সরি ভাই, বাথরুমটা কোনদিকে? খুব চেপেছে!

: এইদিকে স্যার !

শিক্ষা: যেকোনো জরুরি প্রয়োজনে ব্যাংক

বড় স্যার ও অফিসারের আলাপ (১):

: স্যার, আমার ছুটি লাগবে!

: জি, শুক্র-শনিবার আপনাকে ছুটি দেয়া হল!

শিক্ষা: জীবনে যা কিছু আছে, তা নিয়েই সুখি থাকা উচিত!

বড় স্যার ও অফিসারের আলাপ (২):

: বস, আমার কেপিআইটা একটু দেইখেন! এবার সবকিছু ১০০% করেছি।

: হ্যাঁ? ১০০% এ কাজ হবে না, ১২০% করতে হবে!

শিক্ষা: জীবনের দৌড় শেষ হয়ে যাবে, ব্যাংকের দৌড় শেষ হবার নয়!

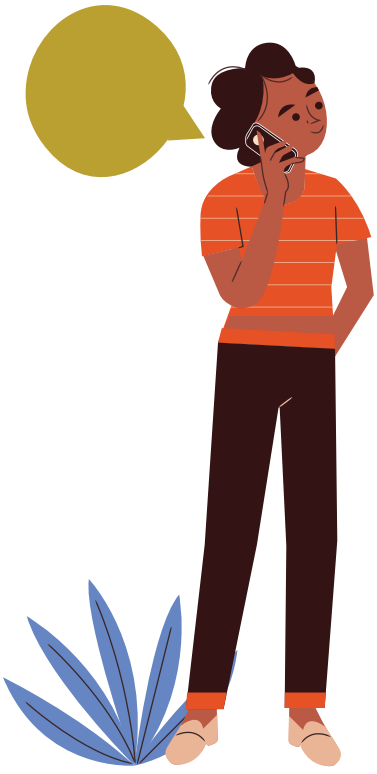

বন্ধুকে ফোন দিলে:

: দোস্ত, তোর একাউন্ট করছিস? আমার ব্যাংকে একটা খুলে ফেল।

: মামা, তুই লাস্ট ৫ বছরে ৩টা ব্যাংক পাল্টাইছিস আর আমার একাউন্ট খুলছিস , আর কতো !

: বন্ধুর জন্য বন্ধু, একাউন্টের পর একাউন্ট!

শিক্ষা: বিপদে বন্ধুর পরিচয়

অফিস শেষে বাসায়:

: ও বৌ, এতো বড় বড় এরা কার ছেলেমেয়ে? আমার নাকি!

শিক্ষা: দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝে না মানুষ!

সকাল থেকে সন্ধ্যা অফিস করা ব্যাংকারের ছেলেমেয়েদের সাথে আলাপ:

: বাবা, তুমি বাসায় আসবে কখন?

: আগামী শুক্রবার সকালে দেখা হবে!

শিক্ষা: সময় গেলে সাধন হবে না!

কোথাও ঘুরতে গেলে রাতের বেলা:

বৌ : সারাদিন হোয়াটসঅ্যাপে কী কর?

ব্যাংকার : শোনো, হোয়াটসঅ্যাপে আমার বন্ধুদের ৪টা গ্রুপ, অফিসের ৫টা, কলেজের ৪টা, পাড়া-প্রতিবেশীদের ৩টা, সামাজিক কল্যাণের ৪টা, ব্যবসায়িক লেনদেনের ২টা, বাড়ির কাজের ২টা, আর ইন্ডিভিজুয়াল চ্যাটে ৮-১০ জনের সাথে কথা চলতেছে...।

শিক্ষা: বেশি যারা ভাবে, তারা জীবনকে উপভোগ করতে পারে না- বুদ্ধদেব গুহ

সালেহ হোসেন, এফএভিপি
ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন

একটু হাসি

এক

ইলন মাস্ক এবং বিল গেটসের মধ্যে কথা হচ্ছিল...

ইলন মাস্ক: গতকাল একটু ব্যাংকে গিয়েছিলাম।

বিল গেটস: কেন?

ইলন মাস্ক: একটা লোনের ব্যাপারে কথা বলতে।

বিল গেটস: তাই নাকি! তা কত টাকা লোন দরকার তোমার?

ইলন মাস্ক: আমার না। লোন দরকার ব্যাংকের!

তিন

বল্টু-পল্টু কথা বলছে...

বল্টু: ভাবছি ব্যাংক থেকে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ নেব।

পল্টু: পাঁচ হাজার কেন? তুই বরং পাঁচ কোটি টাকা ঋণ নে।

বল্টু: কেন?

পল্টু: পাঁচ হাজার টাকা ঋণ করলে সেটা তোর মাথাব্যথা, আর পাঁচ কোটি টাকা ঋণ করলে সেটা ব্যাংকের মাথাব্যথা!

দুই

ব্যাংকে চাকরির জন্য আবেদন করেছে কাশেম। তাকে পরীক্ষা করার জন্য ব্যাংকের বড় কর্তা একটা ছোট্ট কাজ দিলেন। বললেন, 'আবুল সাহেব আমাদের ব্যাংক থেকে মোটা অঙ্কের টাকা ঋণ নিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে আমরা তাঁর পেছনে লেগে আছি, কিন্তু তিনি আমাদের টাকা পরিশোধ করছেন না। পারো তো তার কাছ থেকে আমাদের পাওনা টাকা উদ্ধার করে নিয়ে এসো।'

পরদিনই পুরো পাওনা টাকা উদ্ধার করে হাজির কাশেম। তা দেখে বড় কর্তার চক্ষু তো ছানাবড়া! কর্তা বললেন, 'আশ্চর্য! আমরা এত দিন ধরে পারলাম না, আর তুমি একদিনেই টাকা তুলে ফেললে! কীভাবে পারলে?'

কাশেমের উত্তর, 'সহজ! তাকে বললাম, হয় আপনি আমাদের টাকা পরিশোধ করুন, নয়তো আপনার সব পাওনাদারের কাছে গিয়ে বলব, আপনি আমাদের টাকা পরিশোধ করে দিয়েছেন!'

চার

এক কাস্টমার হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন ব্যাংকে। কর্মকর্তাকে বললেন, 'আমার এখনই টাকা তোলা দরকার। কিন্তু আমি প্রায় এক মাস আগে আমার চেকবই হারিয়ে ফেলেছি।'

কর্মকর্তা: এত দিন আগে চেকবই হারিয়েছেন, আর এখন একথা বলছেন? কেউ যদি আপনার সই নকল করে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে ফেলে?

কাস্টমার: আমাকে কি এত বুদ্ধু ভেবেছেন? সই যাতে নকল করতে না পারে, সে ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছি। চেকবইয়ের সব পাতায় সই করে রেখেছি!

পাঁচ

ব্যাংক কর্মকর্তাকে বলছেন মন্টু মিয়া...

মন্টু: আমি ১০ লাখ টাকা ঋণ নিতে চাই।

কর্মকর্তা: কী উদ্দেশ্যে ঋণ নেবেন?

মন্টু: এই টাকা দিয়ে আমি গাড়ি কিনব।

কর্মকর্তা: ঠিক আছে, আমি ব্যবস্থা করছি। তবে আগেই বলে রাখি, আপনি যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা ফেরত দিতে না পারেন, ব্যাংক আপনার গাড়ি নিয়ে নেবে।

মন্টু: ইশ্! আগে বলবেন না? আগে জানলে আমি ঋণ নিয়ে বিয়ে করতাম

সংকলন ও অলংকরণে-
মো. রবিউল ইসলাম, কাস্টমার সার্ভিস
অফিসার (ক্যাশ), নর্থব্রুক হল রোড ব্রাঞ্চ

ইউসিবি ও বাফুফের মধ্যে চুক্তি: হামজার আগমন

বাংলাদেশের ফুটবলে নতুন সম্ভাবনার দ্বার

গত ১৬ মার্চ, ২০২৫ ইউসিবির চেয়ারম্যান শরিফ জহির ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মামদুদুর রশীদের উপস্থিতিতে ইউসিবি ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)-এর মধ্যে চুক্তি সাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী ইউসিবি বাফুফের কৌশলগত সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালন করবে। সেইসাথে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল ও ফুটবলের অন্যান্য কার্যক্রমকে স্পন্সর করবে। ইউসিবি ও বাফুফের মধ্যকার এ চুক্তি বাংলাদেশ ফুটবলের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে বিজ্ঞজনেরা ধারণা করছেন। ফুটবলের উন্নয়নে ইউসিবি অবদান রাখতে সক্ষম হবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ ফুটবলের আন্তর্জাতিক মান বৃদ্ধি ও ক্রীড়া বাণিজ্য সম্প্রসারণ করতে ইউসিবি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বাফুফের সাথে চুক্তির পরপরই গত ২৫ মার্চ, ২০২৫ ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগের দল লেস্টার সিটির হয়ে খেলা হামজা আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ ফুটবল দলের হয়ে খেলতে নামেন। এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বের বহুপ্রতীক্ষিত ম্যাচে ভারত ও বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত গোলশূন্য ড্র করে।

লেস্টারের একাডেমিতে বেড়ে উঠা হামজার মায়ের বাড়ি হবিগঞ্জের বাহুবলে। তার বাবাও বাংলাদেশি। বাংলাদেশের হয়ে খেলার উৎসাহটা হামজার মা-বাবার দেয়া। তাছাড়া এদেশের মাটি ও মানুষের এতো ভালোবাসা হামজা এড়িয়ে যাবেন কী করে!

হামজা এখন খেলছেন শেফিল্ড ইউনাইটেডের হয়ে। মিডফিল্ডার হিসেবেই খেলেন হামজা তবে বাংলাদেশের হয়ে খেলতে নেমে তাকে পুরো মাঠ দাপিয়ে বেড়াতে দেখা গেছে।

রক্ষণে এসে ট্যাকল, মধ্যমাঠে বলের নিয়ন্ত্রণ আর আক্রমণে নিখুঁত বল বাড়িয়ে দিয়ে গোলের সুযোগ তৈরি করা হামজা এদেশের ফুটবলের জন্য কেভিন ডি ব্রুইনা।

একদিকে লেস্টার সিটির হয়ে খেলা হামজা, অন্যদিকে দেশের অন্যতম সেরা বাণিজ্যিক ব্যাংক ইউসিবির সংযোজন বাংলাদেশ ফুটবলের জন্য একই সময়ে আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশ ফুটবল ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচ দিয়ে অন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে।

হামজার নৈপুণ্যে ইউসিবির এই অংশীদারত্ব বাংলাদেশের ফুটবলকে নিয়ে যাক অনন্য উচ্চতায়। ফুটবল পৌঁছে যাক বিশ্ব দরবারে।

RISE ABOVE THE REST
UCB Annual Business Conclave 2025

UNITED COMMERCIAL BANK PLC | UCB

RISE ABOVE THE REST

TOWN HALL
SUPPORT DIVISIONS
19th APRIL, 2025
UCB

TOWN HALL
SUPPORT DIVISIONS

UCB
২৩৫০+
কোটি
টাকার
ডিপোজিট

নেট ডিপোজিট প্রবৃদ্ধির পর
স্বাধীনতার মাস মার্চে ইউসিবি অর্জন করেছে
২৩৫০+
কোটি
টাকার
ডিপোজিট
এই সাফল্য আমাদের সম্মানিত গ্রাহকদের
বিশ্বাস, ভালোবাসা এবং আস্থার প্রতিফলন
আপনাদের অবিরাম সমর্থনে
আমরা অভিভূত, কৃতজ্ঞ

UCB
২৩৫০+
কোটি
টাকার
ডিপোজিট

স্বাধীনতার
মাস মার্চে
ইউসিবি
অর্জন করেছে
UCB
২৩৫০+
কোটি
টাকার
ডিপোজিট

UCB INVESTMENT Limited

HISTORY MADE!

UCB INVESTMENT LTD. WINS FINANCEASIA'S "BEST INVESTMENT BANK"

www.ucb-investment.com

UCB

সাফল্য সংকলন

ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন | সংখ্যা- ০১ | মার্চ ২০২৫

উপদেষ্টা পরিষদ
মো: আবদুল্লাহ আল মামুন
জীশান কিংশুক হক

সম্পাদনা পরিষদ
মাহফুজা রহমান
কাজী মোহাম্মদ মোসলেহ উদ্দিন
ফারজানা রুমি

কার্যনির্বাহী সদস্য
মীর সাফাত নেওয়াজ
মো. সালাউদ্দিন বাবলু

প্রকাশক
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি

প্রকাশকাল
এপ্রিল ২০২৫

কর্পোরেট অফিস– প্লট CWS (A) – 1, ৩৪ গুলশান অ্যাভিনিউ, ঢাকা ১২১২; © কপিরাইট ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি, সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত